উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

কোর পত্র (আবশ্যিক) ৩০২

প্রবন্ধ সাহিত্য

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় –ক

একক ১ - বিবিধ প্রবন্ধ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভূমিকা।

একক ২ – প্রবন্ধ –উত্তরচরিত ।

একক ৩ - বিদ্যাপতি ও জয়দেব এবং শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা ।

একক ৪ – গীতিকাব্য ।

একক ৫ - বঙ্গাদেশের কৃষক ।

একক ৬ – দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা ।

একক ৭ - আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী ।

পর্যায় –খ

একক ৮ - সাহিত্যচর্চাঃ বুদ্ধদেব বসু - সাধারন আলোচনা ।

একক ৯ – লেখক-পরিচয়: গ্রন্থ-পরিচয়।

একক ১০ - সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা ।

একক ১১ – ‘সাহিত্যচচা’ : গঠনশৈলী ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাঃ টীকা, গ্রন্থপঞ্জি ।

একক ১২ – সাহিত্যচর্চা: প্রবন্ধ সম্পর্কিত টীকা: ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ ।

একক ১৩ – প্রবন্ধ সংগ্রহঃ প্রমথ চৌধুরী ।

একক ১৪ - সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা এবং বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি।

কোর পত্র – ৩০২ (আবশ্যিক) প্রবন্ধ সাহিত্য

পর্যায় –খ

একক ৮ - সাহিত্যচর্চাঃ বুদ্ধদেব বসু - সাধারন আলোচনা – উদ্দেশ্য - স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি - স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল - প্রবন্ধ-সংকল্পের সাধারণ পরিচয় এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলা প্রবলের বিশেষ প্রকৃতি।

একক ৯ – লেখক-পরিচয়: গ্রন্থ-পরিচয় - উদ্দেশ্য - বুদ্ধদেব বসু: সংক্ষিপ্ত জীবনী : ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন - বুদ্ধদেব বসু রচিত গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা - গ্রন্থ পরিচিতিঃ ‘সাহিত্যচর্চা’ - ‘সাহিত্যচর্চা’ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহের সারসংক্ষেপ -

একক ১০ - সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা – উদ্দেশ্য - 'রামায়ণ' - বাংলা শিশুসাহিত্য - সাহিত্যচর্চা - ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে ব্যক্ত লেখক-মনোভঙ্গি আলোচনা - প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মননে ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ - ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে ব্যক্ত বুদ্ধদেব বসুর অভিমত বিশ্লেষণ - বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর অবস্থান: সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

একক ১১ – ‘সাহিত্যচচা’ : গঠনশৈলী ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাঃ টীকা, গ্রন্থপঞ্জি - উদ্দেশ্য - সাহিত্যচর্চা: বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের-গঠন বৈশিষ্ট্য বিচার - বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব বিচার : ‘সাহিত্যচর্চা’।

একক ১২ – সাহিত্যচর্চা: প্রবন্ধ সম্পর্কিত টীকা: ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ - এডওয়ার্ড লিয়র (Edward Lear: ১৮২২-১৮৮৮) - কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ - ১৯৫০) - ক্রিস্টোফার মার্ল (Christopher Marlow : ১৫৬৪ – ১৫৯৩) - গ্রিম ভাই : জ্যকোব গ্রিম (Jakob Grimn : ১৭৮৫ - ১৮৬৩), উইলহেলম গ্রিম (Wilhelm Grimn : ১৭৮৬ – ১৮৫৯) - জিওফ্রে চসার (Geoffrey: Chaucer : ১৩৪৫ – ১৪০০) - জেমস জয়েস (James Joyce: ১৮৮২ - ১৯৪১) - মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (স্যার: ১৮৬০ — ১৯৩০) - মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩ – ১৯৩৮) - ‘মৌচাক’ - যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ – ১৯৩৭) - রবার্ট লুই বালফুর স্টিভেনসন (Robert Louis Balfour Stevenson; ১৮৫০ – ১৮৯৪) - রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪ - ১৯৬৯) - লুইস ক্যারল (Lewis Carroll; Charles Lutwidge Dodgson-এর ছদ্মনাম : ১৮৫০-১৮৯৪) - শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৭ – ১৯৮০) - সুখলতা রাও (১৮৮৬ – ১৯৬৯) - সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯২ - ১৯৬৮) - হারবার্ট জর্জ ওয়েলস (Herbert George Wells :

১৮৬৬ – ১৯৪৬) - হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসন (Hans Christian Anderson : ১৮০৫ - ১৮৭৫) – রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক।

একক ১৩ - প্রবন্ধ সংগ্রহঃ প্রমথ চৌধুরী- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী – ভূমিকা -প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে বলার বিষয়ের চেয়ে বলার ভঙ্গি বড় হয়েছে – বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ – সংক্ষিপ্তসার – আলোচনা – জয়দেব।

একক ১৪ - সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা এবং বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি- সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা – সংক্ষিপ্তসার - ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় তার মূল্য - ‘রচনার প্রধান গুণ এবং প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা ’- 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন - সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পক্ষে এবং বিপক্ষে লেখক যেসব যুক্তি রেখেছেন – বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি।

একক ৮ - সাহিত্যচর্চাঃ বুদ্ধদেব বসু - সাধারন আলোচনা

বিন্যাসক্রম

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ।

৮.৩ স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

৮.৪ প্রবণ-সংক্লপের সাধারণ পরিচয় এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলা প্রবলের বিশেষ প্রকৃতি

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জ

৮.১ উদ্দেশ্য

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকে। খুব দ্রুত বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি হয়ে উঠেছিল নিজস্বতায় উজ্জ্বল। বিশ শতকের প্রথম দিকে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশ-চেতনার ক্রমপ্রসার – প্রভৃতি কারণে

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো প্রবন্ধ সাহিত্যেও এসেছিল পরিবর্তন। রাজনীতি আর স্বদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ক্রমশ প্রবন্ধের সীমাকে করে দিয়েছিল বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রভৃতি কারণে স্বাধীনতার পরের বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল নানা নতুন বাঁক। প্রবন্ধ সাহিত্যেও দেখা গেল না তার ব্যতিক্রম। দুশো বছরের পরাধীনতার অন্তে সদ্য স্বাধীন দেশে যেমন দেখা দিয়েছিল নানা সংকট, তেমনই তার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে নবীন এক চেতনা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রাবন্ধিক-সত্তা এসময়েই বিকাশ লাভ করেছিল। সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ সংকলনটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে।

সাহিত্য কখনই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের জন্য মানুষ সৃষ্টি করে সাহিত্য। মানুষের জীবন আর মনন উভয়ই পরস্পর-সংবদ্ধ। সে কারণে বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সেই সময়টির বিশেষত্ব জেনে নেওয়া দরকার। নতুবা আলোচনা পাবে না সম্পূর্ণতা। স্বাধীনতার পরের প্রথম দুই দশকের বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে বর্তমান একটিতে এই উদ্দেশ্যেই।

৮.২ স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ভারতবর্ষ তথা বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার প্রায় দু-বছর পরে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। তার আগে বিশ্ব দেখেছে ফ্যাসিবাদের কুৎসিত রূপ, একনায়কতন্ত্রের বীভৎস মূর্তি এবং একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের মননশীল মানুষদের সমবেত প্রতিরোধের প্রয়াস। প্রবন্ধ সাহিত্যে এই প্রতিবাদের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল কয়েকজন প্রাবন্ধিকের লেখনীতে। আমরা মনে করতে পারি বিনয়

ঘোষের ‘আন্তর্জাতিক রাজনীতি’ (১৯৪১), ‘ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ’ (১৯৪১), গোপাল হালদারের ‘সংস্কৃতির রূপান্তর’ (১৯৪১) প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল মনুষ্যত্বের অপমান, হিংসার নগ্ন রূপ, স্বার্থসর্বস্বতার নির্লজ্জ প্রকাশ। হিটলার কর্তৃক জার্মান জাতির আর্য-বিশুদ্ধতার রক্ষার জন্য ইহুদি নিধন ও নির্যাতন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরাজয়ের প্রান্তে উপস্থিত জাপানের দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক নিক্ষেপ; ব্রিটিশ সরকারের পোড়ামাটি নীতি ও শস্য নীতির ফলে বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে অগণ্য মানুষের অন্নাভাবে করুণ মৃত্যু তারই প্রমাণ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হল মিত্রপক্ষ। কিন্তু যুদ্ধে ইংল্যান্ড এর ক্ষতির পরিমাণ ছিল অত্যধিক। তার পক্ষে উপনিবেশ হয়ে উঠেছিল ভার। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও তখন অতি উত্তাল। তারই সঙ্গে শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নোয়াখালি-কলকাতা-বিহারে মারা গিয়েছিল অসংখ্য সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণের অদূরদর্শিতা, ব্রিটিশ শাসকের চাতুর্য – দুইয়ের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল কিন্তু দেশ হল খণ্ডিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশসমূহ আর পূর্ব বাংলা নিয়ে গড়ে উঠল পাকিস্তান নামের মুসলিম রাষ্ট্র আর অবশিষ্ট ভারতবর্ষ পরিচিত হল ধর্মনিরপেক্ষ ভারত নামে।

যে জাতিবৈরী ছিল দেশভাগের মূলে তারই ফলে বহু মানুষ স্বভূমি ছেড়ে সর্বহারা হয়ে চলে আসতে বাধ্য হল ভারতে। মূলত পাঞ্জাব আর বাংলার মানুষের ভাগ্যে নেমে এসেছিল এই দুর্ভাগ্য। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু স্রোত প্লাবিত করল পশ্চিমবঙ্গকে। উভয় বাঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা দিল ক্ষোভ। ক্রমে প্রতিবাদের মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠল বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে।

এই সময়েই যিনি দাঙ্গা আর দেশভাগের বিরোধী ছিলেন সেই গান্ধীজিকে হত্যা করা হল প্রার্থনা সভায়। কমিউনিসট দলকে স্বাধীনতার পরের বছরই নিষিদ্ধ করা হল। ১৯৪৬-এ ভাগচাষিরা খুলনা জেলার মউভোগ গ্রামে ফসলের তিন ভাগ পাওয়ার

দাবিতে শুরু করেছিল তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই আন্দোলন। স্বাধীন দেশের পুলিশ। দেশের মানুষের উপরই গুলি চালিয়েছিল এ আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই সব কারণে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল বহু মনীষীর মনে।

তথাপি স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসেবে নতুন এক বোধ উদ্দীপিত করেছিল দেশবাসীদের। কেন্দ্রীয় সরকারও বহু ভাষা-সংস্কৃতি-সমন্বিত দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। দেশের মানুষের মধ্যেও জেগেছিল ভারতীয়ত্বের একটি বোধ। তারই সঙ্গে দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের সংকল্প ধীরে ধীরে বহু মানুষের মনে জেগে উঠেছিল। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা আর সাম্প্রদায়িক বোধের উর্ধ্বে ওঠার ক্ষীণ অথচ অমোঘ এক প্রয়াস ক্রমে দেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। দুর্নীতি, ন্যায়হীনতা, অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া লড়াইয়ের মধ্যেও স্বাধীন দেশের বাসিন্দা হওয়ার দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা জেগে উঠেছিল ধীরে ধীরে। যদিও তার মধ্যে ছিল না আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপ্তি আর গভীরতা; তথাপি আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরকারও দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। দেশের সার্বিক উন্নতির বাসনাও তাদের ছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ পাঁচ বছর ধরে দেশের নির্দিষ্ট কিছু কিছু দিকের ঘাটতি মেটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ তারই প্রমাণ।

আবার একই সঙ্গে রাজনীতিকে স্বার্থসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতাও হয়েছিল শক্তিমান। স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে চীন আক্রমণ করেছিল ভারত (১৯৬২। পরিণামে সারা দেশে দেখা দিগয়েছিল প্রবল দেশপ্রেমের উন্মাদনা। সামাজিক স্তরে আর চিন্তনজগতে লক্ষিত হয়েছিল তার প্রভাব।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রেও দেখা গেল নানা পরিবর্তন। প্রথমত দেখা গেল পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় অধিকাংশ মানুষই পশ্চিম বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন। প্রাথমিক ঈষৎ বিরূপতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত

পশ্চিম বাংলা বিশেষত কলকাতার অধিবাসীবৃন্দ তাদের স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। উভয়ের মনন-চিন্তনের মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠছিল নতুন এক চিন্তাজগৎ।

দ্বিতীয়ত নবাগত উদ্বাস্তুর দল আয়তনে সংকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। একদা সমৃদ্ধ বহু গুহ এদেশে এসে হয়ে গিয়েছিল প্রায় ভিক্ষুক। তথাপি তারা হার মানেনি। কলকাতার উপকণ্ঠের বহু গ্রামসদৃশ স্থান তাদের অনলস শ্রমে হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ। পরিণামে মানবশক্তি, জনসংখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে চিন্তার বহু নতুন দ্বার খুলে গিয়েছিল। যে নতুন প্রজন্ম এদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল মুক্তবুদ্ধি, চিরাগত ধারণামুক্ত চিন্তন-শক্তি।

তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ সম্পর্কে পূর্বাগত ধারণা চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য যে কোনো কাজই মানুষের করা উচিত এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল সমাজে।

চতুর্থত, মেয়েদের ঘরের বাধা ভেঙে গিয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। প্রথাসিদ্ধ মহিলাবৃত্তি শিক্ষিকা-সেবিকার বৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি মেয়েরা। অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে তারা সর্ববিধ কর্ম গ্রহণ করেছিল নিঃসংকোচে। ফলে মেয়েদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গের মেয়েদের মধ্যে তুলনায় শিক্ষার প্রচলন চিরকালই বেশি। তাদের সংস্পর্শে এসে এপার বাংলার মেয়েরাও যেমন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল তেমনই উপলব্ধি করল শ্রমের ভিন্নতা জনিত ধারণার অর্থহীনতা। মেয়েদের মধ্যে এই 'স্ব-শক্তির জাগরণ তাদের চিন্তাজগতেও এনে দিল পরিবর্তন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতার প্রয়োজন বুঝতে শিখল মেয়েরা। ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়ে উঠল নতুনভাবে।

মেয়েদের স্বাধীনতা, তাদের বিবাহ ব্যাপারে স্বাধীন নির্বাচন-প্রবণতা, সকল ব্যাপারে ব্যক্তি হিসেবে। আপনাদের প্রতিষ্ঠা করার মতো বলিষ্ঠ মানসিকতা সমাজে মেয়েদের

অবস্থানকে করে তুলল স্বতন্ত্রতায় বিশিষ্ট। ক্রমে নারীর চরিত্রগত পবিত্রতা, ঐতিহা-পোষিত নীতি মানার বাধ্যবাধকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে এল তাদের মধ্য থেকেই।

ক্রমশ টিকে থাকার বিপন্নতা বিস্তৃত হল জনসমাজে। চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল নীতি, সত্য সম্পর্কে চিরাগত ধারণাসমূহ। ক্রোধ, হতাশা আর সহায়হীনতার ব্যাপ্তি দেখা গেল সমাজের চিন্তনবাহক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে।

একই সঙ্গে দেখা গেল এই সার্বিক বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস। মানুষ হিসেবে, স্বাধীন দেশের নাগরিক রূপে নিজস্ব দায়িত্ববোধের যে উন্মেষ স্বাধীনতার প্রথম দশকে দেখা গিয়েছিল তা নিঃশেষে মুছে গেল না। বরং চিন্তনজগতে তার প্রসার ঘটানোর ধীর প্রয়াস লক্ষিত হল।

স্বাধীনতার পরে একদিকে যেমন যুদ্ধজনিত পদগুলি উঠে যায় অন্যদিকে তেমনই পুব বাংলা থেকে এসে যায় যে কোনো মূল্যে শ্রমদানে সক্ষম ও ইচ্ছুক জনস্রোত। ফলে বেকার সমস্যা বেড়ে যায়, শ্রমের মূল্য যায় কমে।

আবার এরই পাশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে বহু নতুন কর্ম-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, স্কুল এবং প্রাথমিক শিক্ষাদানের কেন্দ্র।

তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশায় মিলে স্বাধীনতার পরের দুই দশকে এপার বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতি উভয়ত এসেছিল দূরপ্রসারী এক পরিবর্তন। পরিণামে বাঙালির চিন্তনজগৎ হয়েছিল সমৃদ্ধ। তার মনোভুবনের সীমা গিয়েছিল বেড়ে। এই পরিবর্তিত চিন্তন অনুভবের প্রকাশ সকল সাহিত্য-সংরূপের মতো প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়েছিল। যার ফলে বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য লাভ করেছিল বলিষ্ঠ চেতনার দীপ্তি।

৮.৩ স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশক: পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। বিশ্ব-পরিস্থিতি তখন খুব একটা অনুকূল নয়। যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত জনজীবন, অর্থনীতি, পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাতাবরণ – সব মিলিয়ে বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক আর সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে চলেছিল আলোড়ন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল দেশকে খণ্ডিত করে। এইসব সমস্যার সঙ্গে ভারত তথা বাংলার ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। তার সঙ্গে ছিল বহু জাতি-ভাষা-সংস্কৃতি অধ্যুষিত দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার মতো কঠিন বাস্তব সংকট।

বাংলার স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশকের সাহিত্যে দেখা গেল এই সংকটক্ষণের প্রতিফলন। তারই সঙ্গে লক্ষিত হল স্বাধীন দেশের নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রবণতা।

একই সঙ্গে স্বাধীনতা-বিরোধী একটি গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরও হয়ে উঠেছিল প্রবল।

সাহিত্যের বিভিন্ন রূপবন্ধে বিশেষত কথাসাহিত্যে দেখা গিয়েছিল এর প্রভাব। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও হয়নি। ব্যতিক্রম। ভারতের ভাষা-সমস্যা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, বিরোধিতার মধ্যে ঐক্যের সূত্রসন্ধান – প্রভৃতি বিষয়ে। রচিত হয়েছিল বিবিধ প্রবন্ধ।

তিরিশ-চল্লিশ দশকের সাহিত্যিকগণ তখনও লিখছিলেন পূর্ণশক্তি নিয়ে। সাম্যবাদ, বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতির নানা সমস্যা নিয়ে রচিত হয়ে চলেছিল প্রবন্ধ। ‘সবুজ পত্র’ যে বুদ্ধিবৃত্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার সূত্রপাত করেছিল তারও ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় স্বাধীনতার পরের দুই দশকে। বাংলা প্রবন্ধের সীমা ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, আঞ্চলিক তথা প্রাদেশিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

চলিত ভাষা প্রবন্ধভাষা হিসেবে নিজেকে করেছিল প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত এ সময়ে দু-একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন সাধু ভাষায় প্রবন্ধ প্রায় লেখা হয়নি বললেই হয়।

সাহিত্য আর সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার ধারাটি এ সময়ে হয়েছিল বিস্তৃত এবং গভীর। বিশেষ একটি প্রবণতা এই সময়ে দেখা দেয় – মার্কসীয় তত্ত্ব-দর্শনের প্রেক্ষিতে সাহিত্যবিচার। বলাবাহুল্য ধারাটির সূচনা স্বাধীনতার পূর্বেই হয়েছিল। এ সময়ে দেখা গিয়েছিল তার প্রসার।।

তিরিশের দশক থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে নিবিড় পাঠের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল বাঙালির মধ্যে। স্বাধীনতার পরে সেই ধারাটির তত্ত্ব অগ্রগমন লক্ষিত হয়।

যে সব বিশেষত্বের কথা আলোচিত হল তাদের মধ্যে সমকাল-সচেতনতা, স্বাধীনতা সম্পর্কে উৎসাহী ও বিরোধী মনোভাব, দাঙ্গা-বিক্ষত, দেশত্যাগে বাধ্য নরনারীর সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ছোটো গল্প, উপন্যাস, ক্বচিৎ কবিতায়।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এদেশে আগমন, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ সংগ্রামের অংশরূপে এর পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষালাভ পাসের ফল হিসেবে তৈরি হয়েছিল বিশাল এক পাঠকসমাজ। পুল জনতার দাবি মেনে জন্ম নিয়েছিল কয়েটি নতুন-পত্র-পত্রিকা। পূর্বতন প্রবাসী, ‘মাসিক বসুমতীর সঙ্গে ‘দেশ’ হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়। বস্তুত স্বাধীনতার পরে বিনোদনমূলকতার সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ,সংস্কৃতির নানা স্তর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখে চলেছিল “দেশ”। বিনোদন-প্রত্যাশী সাধারন মানুষ আর মননশীল বিদ্যাজীবী গোষ্ঠীর কাছে নিজেকে ক্রমে অপরিহার করে ক্রমে অপরিহার্য করে তুলেছিল এই পত্রিকা এবং সম-সময়ের সমধর্মী আরও কয়েকটি পত্রিকা। কিছুটা আদর্শপরায়ণতা সম্ভবত এ সময়ের পত্রিকাগুলিকে চালিত করত। তাই জনরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জনরুচি গঠনের, জনচিত্তকে উন্নত, সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই গ্রহণ করেছিল। একারণে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে প্রবন্ধেরও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এই সব পত্রিকায়। রম্যরচনা নামের লঘু রীতির প্রবন্ধ আগেও দু-একটি লেখা হয়েছিল। মূলত পাঠকের দিকে লক্ষ রেখে লঘু ভঙ্গিতে গুরু বিষয় আলোচনার এ রীতিটি স্বাধীনতার পরেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী।

একই সঙ্গে ছিল ‘পরিচয়’, ‘পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ'-এর মতো কিছু পত্রিকা। বাঙালির সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চার পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধি ছিল এদের উদ্দেশ্য।

বর্ধিত পাঠক সংখ্যার কারণে বেশ কিছু নতুন প্রকাশনা সংস্থাও এ সময়ে দেখা দিয়েছিল। এই সব সংস্থা থেকে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রণের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল কিছুটা পরিবর্তন। মুদ্রণপরিপাট্য, অক্ষরবিন্যাস, কাগজের মান, প্রচ্ছদ ও নাম চিত্রণের সৌষ্ঠব সম্পর্কে সচেতনতা এসেছিল বাঙালি প্রকাশকদের মধ্যে। বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন-সৌকর্য সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁদের মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরের দুই দশকে গবেষণামূলক বাংলা প্রবন্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের প্রচলন। বিশেষত গবেষণা-সন্দর্ভ বাংলায় লেখার অনুমোদন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে করেছিল শক্তিমান ও সমৃদ্ধ।

স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পর বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার সংখ্যা ও মান গিয়েছিল বেড়ে। ছন্দ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধ বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছিল। কবি-কবিতা, নাটক-নাট্যকার, গল্প-গল্পকার, উপন্যাস-ঔপন্যাসিক বিষয়ে মুদ্রিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি উচ্চমানের প্রবন্ধ সংকলন। মূলত প্রয়োজনের তাগিদে রচিত এইসব প্রবন্ধ বাঙালি মনের যুক্তিপরায়ণতার দিকটির বিকাশে সহায়তা করেছিল বলা যায়।

স্বাধীনতার পরে চিত্র, চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক, নৃত্য – সৃষ্টিমূলক সকল শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অংশত এসেছিল 'নতুন ভাবনা-চিন্তা – এ সত্য মানতেই হয়। যদিও বিনোদনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়েছিল উন্নতমানের কয়েকটি সৃষ্টি।

এইসব বিষয়ে প্রবন্ধ ও রচিত হতে শুরু করেছিল। ক্রীড়াকে বিষয় করে বাংলা প্রবন্ধ রচনার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে চীনের ভারত আক্রমণের ফলে যে গাঢ় দেশাত্মবোধের প্লাবন দেখা গিয়েছিল সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে পড়েছিল তার প্রভাব। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়নি ব্যতিক্রম

স্বাধীনতার প্রথম দশকের পরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বর্ধমান আর্থ-সর্বস্বতা আর নীতিহীনতার কারণে অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা দিয়েছিল আত্মমগ্নতা। আপন মনোগহনে মগ্ন থেকে তারা করেছিলেন। সমস্যা-মুক্তির সন্ধান। কয়েকজন সাহিত্যিক অবশ্য সাহিত্যকে করেছিলেন প্রতিবাদের মাধ্যম।

এমনই করে ভালো-মন্দয় মিশে গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার পরের দুই দশকের বাংলার সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল।

৮.৪ প্রবন্ধ- সংকল্পের সাধারণ পরিচয় এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলা প্রবলের বিশেষ প্রকৃতি

প্রবন্ধ – এই সাহিত্য-সংরূপটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে চতুর্থ পত্র প্রথম অর্থের বিবিধ প্রবন্ধ সংক্রান্ত লিখনটিতে। তথাপি আর একবার বিষয়টি মনে করা যেতে পারে।

‘প্রবন্ধ’ শব্দটির অভিধান-সংগত অর্থ প্রকৃষ্ট বন্ধন। তাই বলা যায় শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সংগতি সম্পন্ন বাক্যনিমিত রচনাই প্রবন্ধ। এই অর্থে সকল সাহিত্যকর্মই প্রবন্ধ। সংস্কৃত আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ অর্থেই ‘প্রবন্ধ’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বর্তমান সাহিত্যে এ সংজ্ঞাটি কিন্তু মনন প্রধান বিষয়নির্ভর তথ্য আর যুক্তিকেন্দ্রিক গদ্য রচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। চিন্তনগাঢ়, বিষয়কেন্দ্রিক তথ্যযুক্তি সমাহারে নির্মিত ব্যাখ্যান প্রধান গদ্য নিবন্ধের এই রূপটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এসেছে প্রতীচ্য সংস্রবের ফলে উনিশ শতকে।

ষোড়শ শতকের ফ্রান্স আধুনিক প্রবন্ধের উদ্ভবস্থল। মিশেল আঁতেইন (Michel Eyquenr Montaigne de: ১৫৩৩-১৫৯২) 'Essai' নাম দিয়ে যুক্তি ও তথ্য সমন্বিত বিষয়কেন্দ্রিক নিবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন। বেশ দ্রুত ইংরেজি সাহিত্যে এই সংরূপটি গৃহীত হয়, নাম হয় 'Essay'। ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon: ১৫৬১-১৬২৬)-এর 'Essays" তার প্রথম নিদর্শন। পরে অনেক খ্যাতনামা ব্রিটিশ লেখক লিখতে থাকেন 'এসে'।

দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য লেখক-মননের সুসংগত প্রকাশ। বিষয় এবং উপস্থাপনভঙ্গি – প্রবন্ধে দুটি দিকেরই আছে সমান প্রয়োজনীয়তা। তার সঙ্গে থাকা চাই তথ্য আর যুক্তির সুসমঞ্জস্য বিন্যাস।

প্রবন্ধে সাধারণত কল্পনা বা লেখক-অনুভবের গুরুত্ব কম। প্রমাণ দিয়ে যুক্তির দ্বারা বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় প্রবন্ধে। প্রবন্ধের গতি হয় লক্ষ্য-অভিমুখী: ভাষা হয় আবেগহীন এবং স্পষ্ট। হৃদয় নয় মস্তিষ্কই প্রবন্ধের উৎস। তাই প্রবন্ধে আভাস বা ইঙ্গিতের গুরুত্ব কম।

বিষয়ই প্রবন্ধে গুরুত্ব পায় বেশি। স্রষ্টার মানস-অনুভৱ প্রবন্ধে সচরাচর প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বিষয় প্রধান প্রবন্ধের সমান্তরালভাবে লেখক-অনুভব প্রধান প্রবন্ধ রচনার প্রবণতা পৃথিবীর প্রায় সব সাহিত্যে প্রথমাবধি লক্ষিত হয়।

যুক্তি, তথ্য-সন্নিবেশ, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিন্যাসের প্রাধান্যের পরিবর্তে লেখকের ব্যক্তিগত হৃদয়ভাবকে প্রধান করে রচিত গদ্যলিখনকেও প্রবন্ধের একটি ধারা বলা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) নামের ক্ষুদ্র নিবন্ধটিকে বলা যায় এই তন্ময় প্রবন্ধের সূচক প্রবন্ধ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বালিকা কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই মেয়েটির অকালমৃত্যুতে বেদনার্ত ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় অনুভব স্মৃতিচারণধর্মী এই প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) এরূপ প্রবন্ধের

উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গভীর হৃদয়ভাবের সরল আন্তরিক প্রকাশ আছে এই আত্মচরিতটিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) ‘কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫, বর্ধিত সংস্করণ ‘কমলাকান্ত’ ১৮৮৫) এরূপ লেখক-হৃদয়ের উদ্ভাসচিত্র। তাঁর মনের ক্ষোভ, ক্রোধ, স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম – ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর প্রবন্ধগুলিতে অভিব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৮৮৩), ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭) ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ (১৯০৭) আর ‘আত্মপরিচয়' (১৯১৬) তার অনুভব নিবিড় প্রবন্ধ সমূহের সংকলন।

কিন্তু ক্রমেই এক ধরনের প্রবন্ধ দেখা দিতে লাগল যেগুলিতে বিষয়-নিষ্ঠা, তথ্য, গম্ভীর আলোচনা, সামাজিক সংকট, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাদানের সঙ্গে আত্মভাবনার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি মিলিত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসুর ‘অব্যক্ত’ এই জাতীয় প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭০-১৮৯৯) প্রবন্ধের বিশেষত্ব ছিল মনোভাব-নিবিড় প্রকাশভঙ্গি। বিষয়নির্ভরতার সঙ্গে অনুভবগাঢ়তার এই সম্মিলন তার প্রবন্ধকে করেছে আকর্ষক।

বিংশ শতকে এই একাধারে বিষয় ও বক্তব্যনিষ্ঠ অথচ আত্মভাব-নিবিড় প্রবন্ধশাখাটির সম্যক বিকাশ লক্ষিত হয়। এসময়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬১) আত্মগত নিবন্ধের সংকলন ‘মনে এলো’ (১৯৫৬) এবং ‘ঝিলিমিলি’ (১৯৬৫)। বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে আত্মভাবনার মিশ্রণ তার এরূপ প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ। গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) বুদ্ধিদীপ্ত অনুভবপ্রধান আত্মচিন্তন মূলক প্রবন্ধের শিল্পসফল নির্মাতা। তার ‘বাজে লেখা’ (১৯৪২ : পরিমার্জিত রূপ ‘স্বপ্ন ও সত্য’ ১৯৫১) ‘আড্ডা’ (১৯৫৬) 'বনচাড়ালের কড়চা' (১৯৬০) সংকলন তিনটিতে এধরনের প্রবন্ধ আছে।

এই প্রবন্ধধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপনির্মাতা সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) চিন্তন প্রধান মননমূলক প্রবন্ধকে আত্মগত ভঙ্গির সরসতা ও অন্তরঙ্গতা মিশিয়ে অনুভব-নিবিড় করে প্রকাশ করেছেন তিনি।

বস্তুত স্বাধীনতার পরের দুই দশকে এই শ্রেণির প্রবন্ধই প্রাধান্য পেয়েছে। বিষয়কে লেখক কেমনভাবে দেখেছেন সেই দিকটিই এযুগের প্রবন্ধে লাভ করেছে প্রাধান্য। বক্তব্যের যুক্তি-তথ্যনির্ভর উপস্থাপন অপেক্ষা লেখকমানস বক্তব্যকে কেমনভাবে গ্রহণ করেছে সেই দিকটিই এ যুগের প্রবন্ধে প্রধান হয়েছে। এইসব প্রবন্ধকে কিন্তু কোনোভাবেই লঘু নিবন্ধ বলা যাবে না।

পূর্ববর্তী বিষয়নির্ভর প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধধারার পার্থক্য আছে। বিষয়নির্ভর প্রবন্ধে স্রষ্টার ব্যক্তিমানস বক্তব্যের আড়ালে চাপা পড়ে। আর এই ধারার প্রবন্ধে বক্তার একান্ত আত্মগত ভাবনাই প্রধান হয়ে ওঠে। লেখকের অনুভূতির আলোয় বক্তব্য অভিষিক্ত হয় এই ধরনের প্রবন্ধে। যুক্তি, তথ্য এইসব প্রবন্ধে উপেক্ষিত হয় না। কিন্তু সে সবই লেখকের ভাবনার অনুসারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

দেখা যাচ্ছে আত্মগত ভাবনার সূত্রে জটিল বিষয়ের সংবদ্ধ উপস্থাপনা নীতি উনিশ শতকে শুরু হয়। কিন্তু তখন তা ছিল পার্শ্বিক একটি প্রকরণ। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধে তখন লেখকের স্বীয় অনুভবের ব্যঞ্জনা প্রায়শ থাকত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত হল এর ব্যতিক্রম। ব্যাক্তিমনের ভাবনা-ধারণার সঙ্গে সংলগ্ন হতে লাগল চিন্তননিবিড় প্রবন্ধ। স্বাধীনতার পরের দুই দশকে এই রীতি হয়ে উঠল পুষ্ট । বুদ্ধদেব বসু এই নতুন ধারার অন্যতম বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

৮.৫ অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশকে বাংলার সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক্ত পরিমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে একটি

নিবন্ধ রচনা করুন।

২। স্বাধীনতার পরে বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরিচয় দিন।

৩। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৪। মূলত কোন কোন কারণে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য স্বাধীনতার পরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল?

৫। স্বাধীনতা এবং দেশভাগ বাংলার সমাজজীবনে যে পরিবর্তন এনেছিল তার সামগ্রিক পরিচয় দিন।

৬। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে মূলত কয়টি ধারায় বিভক্ত করা যায়? সেইসব ধারার পূর্ণ

পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৭। বুদ্ধদেব বসুর সমকালের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৮। আত্মগত প্রবন্ধ-ধারার বিশেষত্ব নির্ণয় করুন। স্বাধীনতার পূর্বে এ ধারার প্রবন্ধ কি রচিত হয়েছিল?

৯। প্রবন্ধ সংরূপটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আত্মগত প্রবন্ধের বিশেষত্ব নির্ণয় করুন।

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ সুদক্ষিণা বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭

দাস প্রভাতকুমার কবিতা পত্রিকা সূচিগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসুআমাদের কবিতাভবন, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১

বুদ্ধদেব বসুআমাদের কবিতাভবন, আমার ছেলেবেলা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসুআমাদের কবিতাভবন, আমার যৌবন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসুআমাদের কবিতাভবন, কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৯

বসু সুদীপ - বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

একক ৯ - লেখক-পরিচয়: গ্রন্থ-পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ বুদ্ধদেব বসু: সংক্ষিপ্ত জীবনী : ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন

৯.৩ বুদ্ধদেব বসু রচিত গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা

৯.৪ গ্রন্থ পরিচিতিঃ 'সাহিত্যচর্চা'

৯.৫ 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহের সারসংক্ষেপ

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ-সংকলনের তিনটি প্রবন্ধ আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। সাহিত্যিকের মানসিকতা, তার বোধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে তার সাহিত্যসৃষ্টিকে। বিশেষ করে তার ব্যক্তিজীবন, তার হয়ে ওঠা থেকে গঠিত হয় তাঁর মানসপ্রবণতা। সেই প্রবণতা প্রতিফলিত হয় তার সাহিত্যে। তার জীবন-যাপন পদ্ধতি সৃষ্ট সাহিত্যে অনেকাংশে ছাপ ফেলে। মূল প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে এজন্য বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে জেনে নেওয়া আবশ্যক। একারণে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যজীবন সম্পর্কে এই এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে

বিচিত্রকর্মা এই সাহিত্যিক এবং তার , বহুমুখী রচনাসম্ভারের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পরিচয়ের ফলে তার প্রবন্ধের সঙ্গে চেনাজানা হয়ে উঠবে সহজ। তার প্রবন্ধ-সংকলনের পূর্ণ তালিকা একই কারণে প্রদত্ত হয়েছে।

সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ-সংকলনে স্থান পেয়েছে নানা বিষয়ে রচিত বেশ কিছু প্রবন্ধ। নির্বাচিত প্রবন্ধত্রয় পাঠের জন্য প্রবন্ধ-সংকলনের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া দরকার। কোন পরিস্থিতিতে এ সংকলনের প্রবন্ধসমূহ রচিত হয়েছিল সে তথ্য জানাও প্রবন্ধ পাঠের ক্ষেত্রে জরুরি। পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান সব সময়ই বিষয়ের বোধগম্যতার সহায়ক।

প্রসঙ্গ-সূত্রের উল্লেখও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করে। একারণে সাহিত্যচর্চা' সংকলনটির প্রবন্ধগুলি রচনার প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই এককটিতে।

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক, তার মানস পরিচয় আর প্রবন্ধ-সংকলনের পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে নির্দিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের যথাযথ প্রেক্ষিত রচনাই এই এককটির উদ্দেশ্য।

৯.২ বুদ্ধদেব বসু: সংক্ষিপ্ত জীবনী : ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন

বুদ্ধদেব বসুর জীবনী:

জন্মঃ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় ভুদেবচন্দ্র বসুর বড়ো ছেলে ও বিনয়কুমারীর একমাত্র সন্তান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। সন্তান জন্মের পরেই নিজের পিতার কর্মস্থলে আগত বিনয়কুমারী মারা যান। এ জন্যই তার নাম দেওয়া হয় বুদ্ধদেব। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। চিন্তাহরণ সিংহ, ও স্বর্ণলতা -- উভয়ের স্নেহে দৌহিত্র বুদ্ধদেব বড়ো হয়েছিলেন। এদের বাড়ি নোয়াখালিতে কেটেছিল বুদ্ধদেবের বালক বয়স।

শিক্ষা: বুদ্ধদেবের মাতামহ চিন্তাহরণ পুলিশের দারাোগা হলেও তার বিদ্যাপ্রীতি ছিল অতুলনীয়। তার কাছেই বুদ্ধদেব ইংরেজি, সংস্কৃত ও গণিত পড়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ বুদ্ধদেবের মনে জেগেছিল তার প্রভাবে। প্রথাগতভাবে নয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ – এঁদের রচনা পড়েই বাংলা শিখেছিলেন তিনি।

১৯২২ সালে ঢাকায় আসেন বুদ্ধদেব এবং পরের বছর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস নাইন-এ ভরতি হন। বুদ্ধদেব ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র। চিন্তাহরণের শিক্ষায় তা হয়েছিল আরও শানিত। ১৯২৫-খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন প্রবেশিকা পরীক্ষায়, তার স্থান ছিল পঞ্চম।

এরপর তিনি আই.এ. পড়া শুরু করেন ঢাকার সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কলেজটির গ্রন্থাগারের সম্পদ ছিল প্রতীচীর আধুনিক সাহিত্যের বহু গ্রন্থ। পাশ্চাত্যের নানা পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসত সেখানে। বুদ্ধদেবের সাহিত্য-মন গঠনের পিছনে এ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করলেন বুদ্ধদেব আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পেলেন কুড়ি টাকার মাসিক বৃত্তি। জুলাই মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ইংরেজিতে বি.এ. পড়া শুরু করেন। ১৯৩০-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে স্নাতক হন। ১৯৩১-এ ইংরেজিতে তার স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল হয় একই অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

কর্মজীবন : শিক্ষাজীবনের মতো সহজ ছিল না বুদ্ধদেবের কর্মজীবন। ১৯৩১-এ তিনি কলকাতায় আসেন। বছর দুই কাটে গৃহশিক্ষকের কাজ করে আর গল্প-উপন্যাস লিখে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রিপন কলেজে (এখন নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপনা আরম্ভ করেন বুদ্ধদেব। কিন্তু ১৯৪৫-এ তিনি পদত্যাগ করেন। তার আগেই 'দি স্টেটসম্যান' ("The Statesman)-এ সাংবাদিক (ফ্রি ল্যান্স) হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সালে তিনি এই ইংরেজি দৈনিকটির তৃতীয় সম্পাদকীয় রচনার দায়িত্ব পান। তবে সাহিত্য আনুশীলনে বাধা পড়ায় তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এই

কাজ দুটি বন্ধ করেন। ১৯৫২ সালে সে সময়ের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির বুদ্ধদেব বসুকে একটি দু-মাস মেয়াদি ইউনেস্কো প্রকল্পের উপদেষ্টার কাজ দেন।

১৯৫৩-তে বুদ্ধদেব বসু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান পিটসবার্গ-এ অবস্থিত পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর ওমেন-এ অধ্যাপনার জন্য। কাজটির মেয়াদি ছিল এক বছর। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ স্থাপন করেন। এখানেই তিনি অধ্যাপনা করেন দীর্ঘকাল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান দু-বছরের বক্তৃতা-সফরের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। তার আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর বাকি জীবন ছিল সাহিত্যনির্ভর।

বুদ্ধদেব ছিলেন প্রধানত কবি। কিন্তু সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যই তাকে লিখতে হয়েছিল প্রচুর গল্প-উপন্যাস; এমনকি ছোটোদের জন্য তিনি ভূতের গল্প আর গোয়েন্দা কাহিনিও লিখেছেন। পরিণামে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে বেশ কয়েকটি ভালো গল্প-উপন্যাস।

১৯৭০ সালে তাকে ভারত সরকার পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন। চার বছর পর ১৯৭৪-এর ১৮ মার্চ হঠাৎ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান বুদ্ধদেব বসু।

সাহিত্যজীবনঃ বুদ্ধদেব বালকবয়সেই শব্দচিত্র আর প্রকৃতি-সান্নিধ্যে তৃপ্তি পেতেন। সেই সময় থেকেই স্বয়ং শব্দচিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি। তার প্রথম রচনা ছ-সাত স্তবকের একটি ইংরেজি কবিতা। তখন তার বয়স নয়। এরপরে তিনি বাংলার পুরোনো ছন্দ পয়ার-ত্রিপদীতে রামায়ণ লেখেন। সে সময়ের প্রসিদ্ধ বালকপাঠ্য পত্রিকা ‘মৌচাক'-এ তিনি ছোটো ছোটো কবিতা পাঠাতেন। নিজে বের করেন ‘বিকাশ বা 'পতাকা' নামের হাতে লেখা পত্রিকা। স্থানীয় পত্রিকা ‘তোষিণী’ (ঢাকা) ছাড়া ‘অর্চনা’, ‘নারায়ণ', 'শঙ্খ - কলকাতার এসব পত্রিকায় ছাপা হয় তার কবিতা। কবিতার মতো বুদ্ধদেবের প্রথম গল্পেরও ভাষা ছিল ইংরেজি। সেটি প্রকাশিত হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পত্রিকায়।

তাঁর প্রথম ছোটো গল্প 'একটা বসন্তের দিন'; এর প্রথম ভাগ ঢাকার ‘প্রাচী’ পত্রিকায় ১৩৩১-বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় বের হয়। এ গল্পের শেষ ভাগ পাওয়া যায়নি। বুদ্ধদেব বসুর বয়স যখন সতেরো তখন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘কল্লোল’ পত্রিকায় বের হয় তার গল্প ‘রজনী হলো উতলা। প্রকাশের পরই গল্পটি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। বাংলার সাহিত্য জগৎ উত্তাল হয়ে ওঠে এই গল্প এবং তার লেখককে ঘিরে।

বুদ্ধদেবের পরের উল্লেখ্য রচনা একটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনমূলক এ কবিতা বুদ্ধদেব তখন রচনা করেন এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত সম্মিলনে তা পাঠ করা হয়।

বুদ্ধদেবের প্রথম স্ব-বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত কবিতা ‘বন্দীর বন্দনা'। আই.এ. পরীক্ষার পরের অবকাশে ঢাকায় বাসকালে লেখা কবিতাটিও 'কল্লোল’-এ প্রকাশিত হয়। সময়টি ছিল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন। অর্থাৎ ১৯২৬ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ। একই বছরে তার ‘রজনী হলো উতলা' প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই বুদ্ধদেব সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের স্থানটি খুঁজে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এসময়ে হাতে লেখা পত্রিকা প্রগতি তারই উৎসাহিত সম্পাদনায় বের হত। আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন বৃত্তি। প্রধানত সেই বৃত্তির টাকায় ‘প্রগতি’ ছাপার হরফে বের হয়। বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় দু বছর স্থায়ী পত্রিকাটি আধুনিক কবিতা এবং কবিদের পোষকতা করেছিল। সে সূত্রে সমকালের সাহিত্য জগতে সৃষ্টি করেছিল বাদানুবাদ। ‘শনিবারের চিঠি' নিয়মিত পত্রিকাটিকে বিদ্রুপ-বিদ্ধ করত।

‘সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তি প্রচেষ্টা’ - প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঘোষিত হয়েছিল ‘প্রগতি'-র এই নীতি। জীবনানন্দ দাশকে কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল ‘প্রগতি’। বিষ্ণু দে, অজিতকুমার দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর বহু কবিতা ‘প্রগতি’-তে মুদ্রিত হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন প্রগতির অন্যতম লেখক। তার ‘বিবাহের চেয়ে বড়ো’ এ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস ‘সাড়া’ ধারাবাহিক রূপে ‘প্রগতি’তেই প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুর অনেক প্রবন্ধ যেমন ‘অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ (মাঘ, ১৩৩৪ব.) ‘বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ’ (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৪ব.), ‘প্রগতি’-তে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য তার প্রথম প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়', 'কল্লোল'-এ (চৈত্র, ১৩৩২ব.) মুদ্রিত হয়। তথাপি স্বীকার করতে হবে পত্রিকা-সম্পাদকের কাজ করতে গিয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনায় মন দিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে বুদ্ধদেব বসু সেখানকার ছাত্র-সংসদের সাহিত্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। জগন্নাথ হলের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'-র মান যথেষ্ট ভালো হয় তার প্রয়াসে। তার বিখ্যাত কবিতা ‘কঙ্কাবতী’ - এ পত্রিকাটিতেই বের হয়।

বুদ্ধদেব বসুর স্বকীয়তা-দীপ্ত প্রথম কবিতা-সংকলন ‘বন্দীর বন্দনা’, প্রথম গল্প-সংগ্রহ ‘অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প’ আর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' – তিনটি গ্রন্থই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থরূপ লাভ করে।

পরের বছর বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এসময়ে তিনি সাহিত্যকেই করেছিলেন জীবিকা। পরে স্মৃতিচারণ-সূত্রে তিনি জানিয়েছেন – “আমি লিখছি শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস আর ছোটোগল্প আর ছোটোদের গল্প – আর ফাঁকে ফাঁকে বিনোদ হিসেবে খেয়ালি চালে মজুরিহীন প্রবন্ধ দু-একটা।” (বুদ্ধদেব বসু, ‘আমার যৌবন’, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮২)। অর্থাৎ পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন বিষয়গভীর প্রবন্ধ আর আপন মানস-তৃপ্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়েছিলেন রম্য নিবন্ধ রচনায়।

বুদ্ধদেব বসুর বিশিষ্ট কীর্তি কেবলমাত্র কবিতা ও কবি-কবিতাকেন্দ্রিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা কবিতা প্রকাশ।

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে ‘কবিতা’ প্রকাশিত হয়। তখন সমর সেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘কবিতা’ ছিল একান্তভাবে বুদ্ধদেব-নির্ভর। ১৯৩৮-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র আর ১৯৪০-এ সমর সেনের চলে যাওয়া; পরে নরেশ গুহ (১৯৫৪-

১৯৫৮) বা জ্যোতির্ময় দত্তের (পৌষ ১৩৬৬ ব. সংখ্যা) সহ-সম্পাদনা ‘কবিতা'-র উপর তেমন প্রভাব ফেলেনি। পত্রিকাটি ছাবিবশ বছর চলেছিল (১৯৬১-তে পত্রিকাটি বন্ধ হয়)।

‘কবিতা'-র উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক কবিতার প্রচার, সঠিক সমালোচনা এবং বিদ্বেষজাত বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ। যেসব নতুন কবির কবিতা এ পত্রিকায় প্রথম বের হয় তাদের মধ্যে আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আষাঢ় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'কবিতা'-য় বের হয়েছিল তার কবিতা।

বুদ্ধদেব বসু আর একটি পত্রিকা ‘চতরঙ্গ'-এর প্রথম বছরে (১৯৩৮) যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবির। এ ছাড়া বুদ্ধদেব ‘বৈশাখী' নামের একটি বার্ষিকীরও সহ-সম্পাদক ছিলেন। (১ম প্রকাশ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ -- শেষ প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)।

১৯৩২-এ বুদ্ধদেব বসুর ‘এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে’ গল্প-সংগ্রহটি শ্লীলতাহীনতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। (অনেক পরে তার ‘রাত ভরে বৃষ্টি' (১৯৬৭) একই কারণে অভিযুক্ত হয়। তবে সেবারে বিচারে জয় হয় লেখকের)। পরিণামে বুদ্ধদেবের রচনার প্রকাশক জোটে না। তখনই তিনি ‘গ্রন্থকারমণ্ডলী’ নামে একটি প্রকাশনী গঠন করেন। এই সংস্থা প্রকাশ করেছিল তিনটি কবিতাসংগ্রহ - বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতা সংকলন ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘আমরা’ এবং বুদ্ধদেব বসুর ‘একটি কথা'। প্রকাশনীটি অবশ্য অল্পদিন পরেই উঠে যায়।

'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশের পর বুদ্ধদেব বসু গড়ে তোলেন প্রকাশনা সংস্থা 'কবিতা-ভবন'। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংস্থাটি ‘এক পয়সার একটি’ নামে চার আনা দামের ষোলো পৃষ্ঠার কবিতা-সংকলন বের করতে থাকে। এই গ্রন্থমালার আঠারোটি বইয়ের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’-এর নাম স্মরণীয়। আর একটি স্মরণযোগ্য প্রকাশনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক' (১৯৪০)। পরের বছর থেকে প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় ‘কবিতা-ভবন’ ছোটো গল্প গ্রন্থমালা প্রকাশ শুরু করে। এই সংস্থাটির আর একটি উল্লেখ্য প্রকাশনা ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ নামের একটি সংকলন (১৯৪০)। এ

বইয়ের প্রথম সংস্করণের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব আর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৩-তে বইটির একটি নতুন সংস্করণ মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনের বিকাশকালে সারা পৃথিবীতে ঘনীভূত হয়েছিল ফ্যাসিবাদের ক্রমপ্রসার জনিত আতঙ্ক। বিশ্বের বহু শিল্পী-সাহিত্যিক এই মতবাদের বিস্তার রোধের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ভারতেও দেখা যায়নি এর ব্যতিক্রম। বুদ্ধদেব বসু এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই প্রগতি লেখক সংঘ-এর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রীতির সংযোগ। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে ভবানীপুরে এই সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে অন্যতম সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এখানে তিনি দিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক লেখকের অবস্থা' ('Bengali Literatures Today : Position of Modern Writer') নামের বক্তৃতা। সংঘের মাসিক মুখপত্র 'প্রগতি'-তে তিনি লিখতেন।

ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হন ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ। হৃদয়হীন সেই হননের প্রতিবাদে গড়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। এই সংঘে বুদ্ধদেব সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে মুদ্রিত প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং লিখেছিলেন ‘প্রতিবাদ’ নামে একটি কবিতা। এই কবিতাটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে মুদ্রিত ‘প্রাচীর' শীর্ষক কবিতা-সংকলনে স্থান পেয়েছিল। এসময় তিনি ‘সভ্যতা ও ফ্যাসিজম’ নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তবে পুরোপুরি সাহিত্য প্রাণ বুদ্ধদেব বসু অধিককাল এই সব রাজনীতি-স্পর্শিত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি। নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

৯.৩ বুদ্ধদেব বসু রচিত গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা

মূলত কবি বুদ্ধদেব গল্প-উপন্যাস-নাটক-কাব্যনাট্য-প্রবন্ধ সবই লিখেছেন। লিখেছেন ছোটোদের জন্য কিছু গল্প আর উপন্যাস। এখানে তার প্রবন্ধ ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থের

একটি পূর্ণ তালিকা সংযোজিত হল। পরে দেওয়া হয়েছে, প্রবন্ধ-সংকলনের সম্পূর্ণ তালিকা।

কবিতা সংকলন : (১) 'মর্ম্মবাণী' (১৯২৪), (২) 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), (৩) 'একটি কথা' (১৯৩২), (৪) 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৩), (৫) 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), (৬) 'নতুন পাতা' (১৯৪০), (৭) 'এক পয়সায় একটি' (১৯৪২), (৮) '২২শে শ্রাবণ' (১৯৪২), (৯) 'বিদেশিনী' (১৯৪৩), (১০) 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) (১১) 'রূপান্তর' (১৯৪৪), (১২) 'দ্রৌপদীর শাড়ী' (১৯৪৮), (১৩) 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), (১৪) 'যে আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮), (১৫) 'দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৬৩), (১৬) 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' (১৯৬৬), (১৭) 'একদিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৭১), (১৮) 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৭১)।

উপন্যাস : (১) 'সাড়া' (১৯৩০), (২) 'অকর্মণ্য বা একটি বাঙালি রুডিন' (১৯৩১), (৩) 'মন দেয়া-নেয়া' (১৯৩২), (৪) 'যবনিকা পতন' (১৯৩২), (৫) 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' (১৯৩২), (৬) 'সানন্দা' (১৯৩৩), (৭) 'আমার বন্ধু' (১৯৩৩), (৮) 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৩৩), (৯) 'হে বিজয়ী বীর' (১৯৩৩), (১০) 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩), (১১) 'অসূর্যম্পশ্যা' (১৯৩৩) (১২) 'এলোমেলো (১৯৩৩), (১৩) 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৯৩৪), (১৪) 'সূর্যমুখী' (১৯৩৪), (১৫) 'বিসর্পিল' (১৯৩৪ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যৌথ রচনা), (১৬) 'বনশ্রী' (১৯৩৪ ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ রচনা), (১৭) 'রূপালি পাখি' (১৯৩৪), (১৮) 'লাল মেঘ' (১৯৩৪), (১৯) 'পরম্পর' (১৯৩৪), (২০) 'বাড়ি বদল' (১৯৩৫), (১১) 'বাসর ঘর' (১৯৩৫), (২২) 'পারিবারিক' (১৯৩৬), (২৩) 'পরিক্রমা' (১৯৩৮), (২৪) 'কালো হাওয়া' (১৯৪২), (২৫) 'জীবনের মূল্য' (১৯৪২), (২৬) 'অদর্শনা' (১৯৪৪), (২৭) 'কালবৈশাখীর ঝড়' (১৯৪৫), (২৮) 'বিশাখা' (১৯৪৬), (২৯) 'তিথিডোর' (১৯৪৯), (৩০) 'মনের মতো মেয়ে' (১৯৫১), (৩১) 'নির্জন স্বাক্ষর' (১৯৫১), (৩২) 'তুমি কি সুন্দর' (১৯৫১). (৩৩) 'মৌলিনাথ' (১৯৫২), (৩৪) 'ক্ষণিকের বন্ধু' (১৯৫২), 'অনেক রকম' ১৯৩৩ নাট্য-উপন্যাসের মার্জিত রূপ), (৩৫) 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (১৯৫৪: প্রতিভা বসুর সঙ্গে যুক্ত

রচনা), (৩৬) 'শেষ পাণ্ডুলিপি' (১৯৫৬), (৩৭) 'শোনপাংশু' (১৯৫৮), (৩৮) 'নীলাঞ্জনের খাতা' (১৯৬০) (৩৯) দুই ঢেউ, এক নদী" (১৯৬০: ১৯৩৬-এ মুদ্রিত 'পারিবারিক উপন্যাসের সংস্কৃত রূপ), (৪০) 'পাতাল থেকে আলাপ' (১৯৬৭), (৪১) "রাত ভরে বৃষ্টি' (১৯৬৭), (৪২) "গোলাপ কেন কালো" (১৯৬৭), (৪৩) আয়নার মধ্যে। 'একা' (১৯৬৮), (৪৪) 'বিপন্ন বিস্ময়' (১৯৬৯), (৪৫) 'রুকমি' (১৯৭২)।

গল্প-সংকলনঃ (১) 'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০), (২) 'রেখাচিত্র' (১৯৩১), (৩) 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' (১৯৩২), (৪) 'রঙিন কাচ' (১৯৩৩), (৫) 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩), (৬) 'ঘুমপাড়ানি' (১৯৩৩), (৭) "মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪) (৮) 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪), (৯) 'শ্বেত পত্র' (১৯৩৪), (১০) 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৪), (১১) 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৩৬), (১২) 'নতুন নেশা' (১৯৩৬), (১৩) 'ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪১), (১৪) হাওয়া বদল' (১৯৪৪), (১৫) 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' (১৯৪৫), (১৬) 'পিরানদেল্লোর গল্প' (১৯৪৫), (১৭) 'একটি কি দুটি পাখি' (১৯৪৬) (১৮) 'চার দৃশ্য' (১৯৫৫), (১৯) 'একটি জীবন কয়েকটি মৃত্যু' (১৯৬০), (২০) 'হৃদয়ের জাগরণ' (১৯৬১), (২১) "ভাসো আমার ভেলা" (১৯৬৩), (২২) তুমি কেমন আছো' (১৯৬৭ ; গল্প ও নাটক), (২৩) "প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প' (১৯৭২)।

নাট্য-উপন্যাস: (১) "অনেক রকম (১৯৩৩), (২) 'জলতরঙ্গ' (১৯৩৩)।

নাটক: (১) মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪: 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ), (২) তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬), (৩) কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ' (১৯৬৮), (৪) পুনর্মিলন' (১৯৭০)

কাব্যনাট্য : (১) কাল সন্ধ্যা (১৯৬৯), (২) 'অনাম্নী অঙ্গনা' ও 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০), (৩) সংক্রান্তি/ প্রায়শ্চিত্ত ইক্কাকু সেনিন' (১৯৭৩) "প্রায়শ্চিত্ত'; ইয়েটস (William Butler Yeats : ১৮০৫ ১৯৫০) - এর 'পার্গেটরি' নাটকের অনুসরণে লেখা। ইক্কাকু সেনিন কোম্পারু মোতায়াসু-র লেখা 'নো নাটকের (জাপান-এর বিশেষ রীতির নাটক) অনুবাদ।

অনুবাদ : (১) 'হাউই' (১৯৪৪ : অস্কার ওয়াইল্ড-এর অনুবাদ), (২) 'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৬০), (৩) 'ডাক্তার জিভাগো' (১৯৬০: বরিস পাস্তেরনাক : Boris Leonidovich Pasternak : ১৮৯০-১৯৬০-এ নামের উপন্যাসের অনুবাদ), (৪) শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, (১৯৬১ : Charles Pierre Baudelaire ; ১৮২১-১৮৬৭), (৫) 'হোল্ডার্লিনের কবিতা' (১৯৬৭ Johann Chrishtian Friedrick Holderhin : ১৭৭০-১৮৪৩) (৬) রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' (১৯৭০; Rainer Maria Rilka : ১৮৭৫-১৯২৬)।

কিশোরসাহিত্য : গল্প-সংকলন : (১) ঘুমপাড়ানি'' (১৯৩৩), (২) সাগর-রহস্য (১৯৩৫ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), (৩) কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড' (১৯৩৫), (৪) ''আজগুবি জানোয়ার' (১৯৩৬ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), (৫) শনিবারের বিকেল' (১৯৩৬), (৬) 'গল্প-ঠাকুর্দা' (১৯৩৮), (৭) 'এক পেয়ালা চা' (১৯৩৯), ৮) "পথের রাত্রি" (১৯৪০), (৯) 'ভদ্রতা কাকে বলে' (১৯৪১), (১০) 'ঘুমের আগের গল্প' (১৯৪১), (১১) 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩), (১২) 'রান্না থেকে কান্না' (১৯৫৬), (১৩) 'জ্ঞান থেকে অজ্ঞান' (১৯৫৮), (১৪) 'বই ধার দিয়ো না' (১৯৬৬), (১৫) ''হাসির গল্প" (১৯৬৮)

কিশোর অনুবাদ-গল্প : (১) অপরূপ রূপকথা (১৯৩৫) হান্স অ্যান্ডারসন। (Hans Christian Anderson : ১৮০৫- ১৮৭৫)-এর রূপকথার অনুবাদ।

(২) সুখী রাজপুত্র (৩) স্বার্থপর দৈত্য (১৯৫৬-তে মুদ্রিত এই দুটি বই অস্কার ওয়াইল্ড - Oscar Fingal O'Flahertic Wills Wilde; ১৮৫৪-১৯০০-এর লেখার অনুবাদ)। (৪) হামলিনের বাঁশিওয়ালা (১৯৬০)

কিশোর-উপন্যাস

(১) দস্যুর দলে ভোমরা (১৯৪০), (২) 'ছায়া কালো-কালো' (১৯৪২), (৩) 'ভূতের মতো অদ্ভুত' (১৯৪২), (৪) 'অন্য কোনোখানে' (১৯৫০), (৫) 'তাসের প্রাসাদ' (১৯৫১)

ছোটোদের কবিতা-সংকলন: 'বারোমাসের ছড়া' (১৯৫৬)

১৯৪৫-এ কবিতা ভবন থেকে বুদ্ধদেব বসুর একটি রচনাপঞ্জি মুদ্রিত হয়। সেই পঞ্জিতে তার লেখা ঢাকার সন্তোষ লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত দুটি ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের নাম 'English For Boys and Girls, Primer Readers -I-V (১৯৩৮) এবং 'The World We Live In' (১৯৩৯) আছে।

প্রবন্ধ সংকলন তালিকা:

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সংকলনগুলিকে ভ্রমণ কথা, স্মৃতিচারণ, রম্য নিবন্ধ এবং গুরু বিষয়ের প্রবন্ধ এই চার ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। ভ্রমণ কথাঃ (১) 'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭), (২) 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৭), (৩) সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), (৪) 'জাপানী জর্নাল' (১৯৬২), (৬) দেশান্তর'' (১৯৬৬)।

স্মৃতিবিবৃতি : (১) 'আমার ছেলেবেলা' (১৯৭৩), (২) আমার যৌবন (মরণোত্তর : ১৯৭৬), (৩) 'আমাদের কবিতা ভবন' (মরণোত্তর : ২০০১)।

রম্য নিবন্ধ : (১) 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫), (২) উত্তরতিরিশ (১৯৪৫)

গভীর বিষয়ের প্রবন্ধ : (১) কালের পুতুল' (১৯৪৬), (২) সাহিত্যচর্চা' (১৯৫৪), (৩) রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' (১৯৫৫), (৪) স্বদেশ ও সংস্কৃতি' (১৯৫৭), (৫) সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ'(১৯৬৩), (৬) কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬), (৭) প্রবন্ধ-সংকলন' (১৯৬৬), (৮) 'মহাভারতের কথা (মরণোত্তর : ১৯৭৪), (৯) কবিতার শত্রু ও মিত্র (মরণোত্তরঃ ১৯৭৪), (১০) 'An Acre of Green Grass' (১৯৪৮), (১১) "Tagore : Portrait of a Poet' (১৯৬২)

৯.৪ গ্রন্থ পরিচিতিঃ 'সাহিত্যচর্চা'

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় প্রবন্ধ-সংকলন 'সাহিত্যচর্চা'। এ সংকলনে সংখ্যা চিহ্নিত তিনটি গুচ্ছে, প্রান পেয়েছে আটটি প্রবন্ধ। বিষয়ের ভিত্তিতে এই বিভাগ করেছেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু নিজেই। প্রথম বা চিহ্নিত গুচ্ছে, স্থান পেয়েছে, সাহিত্যভিত্তিক দুটি ও

একটি সাহিত্যিক বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ। প্রবন্ধ তিনটির নাম রানে রামায়ণ, রচনাকাল ১৯৪৭; ‘মাইকেল’, রচনাকাল ১৯৪৬; এবং ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’, রচনার সময় ১৯৫২। '২' চিহ্নিত দ্বিতীয় গুচ্ছে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ ত্রয়ের নাম ও রচনাসময় যথাক্রমে ‘বাংলা ছন্দ’; রচনাকাল ১৯৪৬, ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’; লেখার সময় ১৯৫২। ‘রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা রচিত হয়েছিল ১৯৪৭-এ। '৩’ সংখ্যক শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ‘সাংবাদিকতা, ইতিহাস সাহিত্য’ (১৯৪৭) এবং ‘শিল্পীর স্বাধীনতা' (১৯৫২) - এই দুটি প্রবন্ধে-সাহিত্য সংক্রান্ত সমকালের সমস্যা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

‘সাহিত্যচর্চা’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশক, সিগনেট প্রেস। বইটির প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। (১৯২১-১৯৯২) একশো চুরানব্বই পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল তিন টাকা। ১৯৬১ সালে বইটির দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ বের করে ত্রিবেণী প্রকাশন। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকে দেন পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭)। তিন টাকা, বারো আনা দামের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮+১৫৯। এই সংস্করণে ‘বাংলা শিশুসাহিত্য' আর 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধাদয়ে যুক্ত হয়েছিল প্রাসঙ্গিক দুটি পাদটীকা। এছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এই আটটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি মুদ্রিত হয় কবিতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। সময়ক্রম অনুসারে এই পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশের কাল 'মাইকেল'; 'কবিতা’ পৌষ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। বাংলা ছন্দ' একই বছরের চৈত্র সংখ্যা কবিতা'-য় প্রকাশিত হয়। 'রামায়ণ' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'-য়। সাংবাদিকতা ইতিহাস সাহিত্য বের হয় কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রকাশ লাভ করে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ‘কবিতা'-য়।।

‘কবিতা’-মূলত কবিতা এবং কবিতা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটিতে যে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল তা এ থেকে প্রমাণিত হয়।

মন্তব্য

এই আটটি প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কিত আলোচনার প্রসঙ্গ। ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটির উৎস ছিল রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) করা বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশ। ‘বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার উপলক্ষ্য সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩), কুলদারঞ্জন রায়চৌধুরী আর সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)-এর কিছু গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ।

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) - রচিত ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে ‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধের মূল অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ কেমন করে বাংলা ছন্দ ব্যবহারের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন তারই উদাহরণ সমন্বিত আলোচনা।

অন্য পাঁচটি প্রবন্ধ রচনার উপলক্ষ সম্ভবত সমকালের বিবিধ ঘটনার অভিঘাত। সাহিত্যচর্চা'-র তিনটি প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’, ‘রামায়ণ’ এবং ‘বাংলা শিশুসাহিত্য স্থান পেয়েছে বুদ্ধদেব বসুর জীবৎকালে প্রকাশিত ‘প্রবন্ধ সংকলন' (১ম প্রকাশ ১৯৬৬)-এর প্রথম খণ্ড । এ গ্রন্থে ‘রামায়ণ’ ও ‘বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিমার্জিত হয়েছে।

৯.৫ ‘সাহিত্যচর্চা’ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহের সারসংক্ষেপ

‘সাহিত্যচর্চা'র তিনটি গুচ্ছে আছে আটটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধাবলির মধ্যে প্রথম গুচ্ছের দুটি ‘রামায়ণ’, ও ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ এবং দ্বিতীয় গুচ্ছের একটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠসূচির অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মনন-বিশেষত্ব ও লেখনী-বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়ার জন্য আটটি প্রবন্ধ পড়ে নেওয়া উচিত। এই কারণে পাঠপরিধিভুক্ত তিনটি ও তার বাইরের প্রবন্ধপঞ্চক মোট আটটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ এই অংশে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

‘সাহিত্যচর্চা' '১' চিহ্নিত গুচ্ছের প্রথম প্রবন্ধ সংখ্যা-নির্দিষ্ট ছয় অধ্যায়ের ‘রামায়ণ”। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) “ছোট্ট রামায়ণ (১৯১১) পাঠের বাল্য স্মৃতির কথা দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তারপরে আছে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ (শ্রীরামপাঞ্চালী) আর মূল বাল্মীকি-রামায়ণের তুলনাত্মক আলোচনা। বুদ্ধদেব বসুর এই মত যথার্থ যে বিষয়, চরিত্র,পরিবেশ সব দিক দিয়েই কৃত্তিবাস রামায়ণ কথাকে সর্বতোভাবে বাঙালি মনের উপযোগী করে তুলেছেন। ফলে মূল মহাকাব্যের স্বাভাবিকতা আর উদাত্ত গাম্ভীর্য হয়েছে অন্তর্হিত।

বাঙালির কাছে মূল বাল্মীকি-রামায়ণের রস গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল ভাষা। রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)-র বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ দূর করেছে, সেই অন্তরায়। উপরন্তু সুলিখিত একটি ভূমিকা এবং প্রয়োজনমতো অনুবাদ সহ মূল শ্লোকের সংযোজন পাঠককে দিয়েছে মূলের রস উপভোগের সুযোগ। এ প্রসঙ্গে আবার এসেছে কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির রচনার তুলনা।

প্রবন্ধের চার ও পাঁচ অধ্যায়ে উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধদেব বসু বাল্মীকি-চিত্রিত রাম চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে বাল্মীকি রামকে দোষে-গুণে জড়িত স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি রামকে করে তুলেছেন কর্তব্যপালনে নিষ্ঠুর জটিল চরিত্রের এক মহামানব।

প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের অসংগতিসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে রামায়ণ জীবনের ভাষারূপ। বাল্মীকির আদি মহাকবিসুলভ নৈর্ব্যক্তিক শিল্পদৃষ্টিতে জীবনের সত্য রূপটি ধরা পড়েছে এবং সে রূপই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাস্তব জীবনে অসংগতি বর্তমান। এ কারণে রামায়ণে স্থান পেয়েছে সংগতিহীনতা। এর ব্যতিক্রম ঘটলে রামায়ণ আদি মহাকাব্য হতে পারত না, হত আধুনিক কাব্য।

সাহিত্যচর্চার '১' চিহ্নিত গুচ্ছের দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম ‘মাইকেল’। বুদ্ধদেব বসু তিন অধ্যায়ের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সাহিত্যকৃতির নঞর্থক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে মাইকেল বাংলা ভাষার প্রকৃতি বুঝতে পারেননি – তাই তার কাব্য, নাটক যথার্থ সাহিত্য হতে পারেনি। বাঙালির

ধুসূদন-মুগ্ধতার কারণ আপন বর্ণাঢ্য জীবনের অঙ্গ হিসেবে এসেছে তার সাহিত্য। একুশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ - ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী'-তে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর একটি বিরূপ সমালোচনা করেন। পরে তিনি এই কাব্য ও মধুসদনের মূল্য স্বীকার করেছিলেন (দ্র, "সাহিত্য সৃষ্টি" : 'সাহিত্য' : ১৯০৭)। বুদ্ধদেব কিন্তু প্রথম সমালোচনাটিকেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' - (১৮৬১)-এর এই মূল্যায়ন বলেছেন। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' কবি-অনুভব জাত সৃষ্টি নয়। মহাকাব্যের লক্ষণ মেনে নির্দিষ্ট রসগুলির হিসেবি ব্যবহারে নির্মিত কাব্যটি হয়ে উঠেছে আড়ম্বরময় শব্দের কারুকর্মে শোভিত প্রাণশূন্য প্রাসাদ।

মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন মাত্র; বাংলা সাহিত্যে সে সাহিত্যের অনুভব এনে দিতে পারেননি। প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন বাংলা সাহিত্যে সঞ্চার করেন রবীন্দ্রনাথ।

পুরাণ-চরিত্রের নতুন রূপ দিয়ে আধুনিক জীবনের সঙ্গে তাদের রবীন্দ্রনাথের মতো যুক্ত করে দিতে পারেননি মধুসূদন। পুরাণ-চরিত্র নির্মাণে তিনি চিরাগত ধারণারই অনুসরণ করেছেন। তাই তার সীতা মহিমময়ী আর রাবণ দুশ্চরিত্র।

বুদ্ধদেবের মতে মাইকেলের দ্বিতীয় ত্রুটি বিরতিহীন চর্চা ও ব্যবহারের দ্বারা ভাষার সঙ্গে যে প্রাণের যোগ গড়ে ওঠে তার অভাব। তিনি বাংলা ভাষাকে জোর করে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তার সাহিত্যভাষা অনুভব-হীন শব্দ-কৌশলে পর্যবসিত হয়েছে। এ বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) মত – মাইকেল বাংলা জানতেন না – সমর্থন করেছেন বুদ্ধদেব।

মধুসূদনের তৃতীয় দোষ এই যে তিনি বোঝেননি মহাকাব্যের দিন চলে গেছে। সময়োপযোগী সাহিত্য প্রকরণ নির্বাচনে তিনি অক্ষম। কারণ বুদ্ধদেবের মতে ব্যাপ্ত পাঠ, বিবিধ ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও মাইকেলের মধ্যে ছিল না সাহিত্যবোধের সূক্ষ্মতা বা ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। তার সাহিত্য তাই হয়ে গেছে কেবল চলিত রীতির অনুকরণ। জীবন্ত চরিত্র ও প্রাণময় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করতে পারেননি। তাই 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) -এর নায়িকাগণ কেবল প্রথাবদ্ধ বিরহিণীমাত্র। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৯৬১)-এর প্রেম বা

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)-র প্রকৃতি বর্ণনা – কবি-আনুভবের অভাবে কোনোটিই হয়ে ওঠেনি প্রাণস্পন্দনযুক্ত সার্থক সাহিত্য। তার নাটকত্রয় (শর্মিষ্ঠা নাটক : ১৮৫৯, 'পদ্মাবতী নাটক' ১৮৬০, কৃষ্ণকুমারী নাটক' : ১৮৬১) সম্বন্ধে একই কথা বলতে হয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)-এই প্রহসন দুটির প্রথমে মাইকেল কিছুটা সজীবতা সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তা টিকে থাকেনি।

বুদ্ধদেব বসুর মতে মাইকেলের একমাত্র কৃতিত্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দের নির্মাণ দ্বারা পদান্ত যতির বাধা ভেঙে বাংলা ছন্দে প্রবহমানতা সঞ্চার। এক্ষেত্রেও তার মত মধুসুদন সচেতনভাবে একাজ করেননি। তার প্রমাণ এ ছন্দে অপ্রচলিত অভিধানিক শব্দের বহুল ব্যবহার, এবং শিশুসুলভ শব্দ প্রয়োগ। এ ছন্দে বাংলা ভাষার এ সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি এ ছন্দ। বাংলা ছন্দে প্রবহমানতা এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সে ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রভাব ছিল না।

বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ-শেষে স্বীকার করেছেন মধুসূদন ছিলেন সচেতন গঠনশিল্পী। বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ প্রয়োগ, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা ছিল তাঁর। মধুসূদনের অলংকার-ভারাক্রান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের চড়া সুর ও ভাষণধর্মিতার কারণ সূচনাকালীন কর্মের স্বাভাবিক অতিরেক প্রবনতা।

মিলবৈচিত্রের জন্য প্রবহমান ছন্দের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন মধুসূদন। পদান্তমিল ও স্বাধীন যতিযুক্ত তাঁর সনেটগুচ্ছ এর প্রমাণ। তিনি না জেনে গদ্য ও পদ্যের সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। সুস্থ দেহমন ও দীর্ঘ আয়ু পেলে হয়তো তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন এই কঠিন কাজ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঠিক ব্যবহার ভিন্ন তিন মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দও তিনি নির্মাণ করতে পারতেন।

মধুসূদনের সাহিত্যসৃষ্টি ক্ষমতার প্রমাণ 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসন দুটির জীবন্ত সংলাপ আর 'হেক্টর বধ' (১৮৭১)-এর গম্ভীর উদার গদ্য। আপন সাহিত্য-সম্ভাবনার সম্যক ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি কেবল বিবিধ সাহিত্য-সংরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই মগ্ন ছিলেন। স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রবণতাকে উপেক্ষা করাই মধুসূদন-সাহিত্যের মুল ত্রুটি। তাই সঠিক ট্র্যাজেডি ধারণার

অভাব সত্ত্বেও ট্রাজেডি রচনা করতে গিয়ে তিনি বিফল হয়েছেন। গদ্যস্বাদী কাব্যভাষার নাট্যোপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতনতা সত্ত্বেও রচনা করেননি কাব্যনাট্য; অনুভূতি-প্রধান গীতিকবিতা আধুনিক সাহিত্যের প্রাণ-লক্ষণ জেনেও লেখেননি গীতিকবিতা।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব আর ভাষা শিক্ষা বিষয়ে স্ব-ক্ষমতার প্রয়োগ-যথার্থতা সম্পর্কে অসচেতনতা – এ দুই কারণে বাংলা কবিতাকে সম্মানযোগ্য করে তুলেও মধুসূদন প্রকৃত পথপ্রদর্শক সাহিত্যস্রষ্টা হতে পারেননি।

লক্ষণীয় যে প্রবল বিরূপতা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব মধুসূদনের প্রতিভা যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল - এ সত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

সাহিত্যচর্চা'র '১' চিহ্নিত বিভাগের শেষ প্রবন্ধ 'বাংলা শিশুসাহিত্য'। সাত অধ্যায়ের এই প্রবন্ধটিতে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগকে বুদ্ধদেব বসু সোনালি ভোরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ সময়ের লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। এ সময়ের কিশোর সাহিত্যিকগণ বয়স্কপাঠ্য রচনা লিখতেন না। অবশ্য 'ননসেন্স' ও বিভিন্ন ধরনের কৌতুক রচনায় নিপুণ সুকুমার রায়ের রচনায় আছে বয়স্ক মনের খোরাক। তবে শিশু-কিশোরদের মনের মতো করে তাদের ভাষায় গল্প বলা এযুগের বিশেষত্ব। 'সন্দেশ' (১৯১৩) পত্রিকার পৃষ্ঠায় আছে এর প্রমাণ।

এরপরে এল 'মৌচাক' (১৯২০)-এর যুগ। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কিশোরসাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯৩০-১৯৮৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), লীলা মজুমদার (১৯০৮) প্রমুখ সাহিত্যিক – যারা বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যের কৃতী লেখক। ফলে এযুগের কিশোরসাহিত্য হয়ে উঠেছে সর্বজনভোগ্য। রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনি, বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনি, কৌতুক গল্প, ব্যঙ্গতির্যক ছড়া – প্রভৃতি বিবিধ রসের রচনা এযুগের কিশোরসাহিত্যকে করে তুলেছে বিচিত্র রসসমৃদ্ধ। এঁদের মধ্যে লীলা

মজুমদারের লেখায় কিশোরদের ভাষায় তাদের কথা বলার সুরটি অনুভূত হয়। অন্য লেখকদের লেখায় প্রায়শ এসে গেছে বয়স্কপাঠ্যতার আভাস।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) কিশোরদের প্রতি সহজ প্রীতির কারণে নিজস্ব ধরনে লিখেছেন কিছু কাহিনি। তার সেই কথাসাহিত্য বয়স্কগণও উপভোগ করতে পারেন।

সদ্য পড়তে শেখা বালক-বালিকাদের জন্য প্রথম যুগের লেখক সুখলতা রাও-এর গল্পগুলির তুলনীয় লেখা বিরল। অবশ্য তার গল্পগুলি স্বাধীন সৃষ্টি নয়, জার্মান লেখক গ্রিনভাইদের সংকলিত রূপকথার অনুসরণে তিনি লিখেছিলেন এইসব গল্প।

ছোটোদের পড়তে শেখানোর দুটি অনবদ্য বই আছে বাংলায়। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’ (১৮৯৭) আর রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ' (১-২খণ্ড : ১৯৩০)। দুই লেখকই ভাষা দিয়ে ছবি এঁকে অনিচ্ছুক শিশুমনে, সৃষ্টি করেন পাঠের আগ্রহ। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থে তার সঙ্গে আছে লেখকের আঁকা ছবি। ‘সহজপাঠ'-এর ভাষাচিত্রে, ছন্দে আর ভাষা ব্যবহারে আছে সাহিত্যরসের ছোঁয়া। ভাষা শেখার সঙ্গে বইটি বালকমনকে দেয় সাহিত্যরস উপভোগের শিক্ষা।

প্রবন্ধ-সমাপ্তিতে বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত গার্হস্থ্য-প্রিয় বাঙালি মনে আছে শিশুর প্রতি সহজাত ভালোবাসা। ফলে শিশুসাহিত্য রচনায় তার আছে সহজাত নিপুণতা। এই স্বভাবদক্ষতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ সাহিত্যিক প্রতিভার সম্মিলন বাংলা শিশুসাহিত্যকে দিয়েছে চিরন্তনত্বের দীপ্তি। তাই সাময়িক রুচিবিকৃতি এ সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। স্বমহিমায় এ সাহিত্য চির ভাস্বর।

‘সাহিত্যচর্চা’র ‘২' সংখ্যক গুচ্ছের প্রথম এবং এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো প্রবন্ধ ‘বাংলা ছন্দ’। আট অধ্যায়ের এ প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেনের (১৮৯৭-১৯৮৬) “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ” বইটির আলোচনা সূত্রে বাংলা ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ বিচারের ঘাটতিগুলিও

যুক্তি আর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। ১৯৪৬-এ রচিত প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রদত্ত তৎকালীন ছন্দ-সংজ্ঞা।

বুদ্ধদেব বসুর মতে সাহিত্য যখন সমৃদ্ধ হয় তখনই দেখা দেয় ছন্দ-বৈচিত্র্য। বাংলা কবিতায় প্রথম ছন্দ-বিচিত্রতা দেখা দেয় বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে। তারপরে রবীন্দ্রনাথ বাংলার পয়ার বা যৌগিক ছন্দ (পরে মিশ্রকলাবৃত্ত নাম দেন প্রবোধচন্দ্র) এবং স্বরবৃত্ত (পরে দলবৃত্ত সংজ্ঞা দিয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র) – এদুটি ছন্দকে নানা রূপদানে ঐশ্বর্যময় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তার নিজস্ব নির্মাণ তিন মাত্রার মাত্রাবৃত্ত (পরে যার নাম কলাবৃত্ত দিয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র)। যুক্ত বর্ণ দুমাত্রা হিসেবে গণ্য হয় এ ছন্দে। 'মানসী' (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয় এ ছন্দ ব্যবহার শুরু করেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছন্দ-পরিভাষা নিয়ে প্রবোধচন্দ্রের মত-সমর্থক আলোচনার পর বুদ্ধদেব স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এ ছন্দে পয়ার যৌগিক ছন্দের মতো ফাঁক থাকে। কবি ইচ্ছামতো সে ফাঁক রেখে দেন বা পূর্ণ করেন। আবার যুক্তবর্ণ বা যুগ্মধ্বনিকে দু মাত্রা গণনা করা হয় এ ছন্দে মাত্রাবৃত্তের মতোই। সাদৃশ্য সত্ত্বেও স্বরবৃত্ত স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল কঠিন নিয়মে আবদ্ধ ছন্দ। কবিতায় স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একত্র ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা ছন্দের প্রকৃতি প্রবন্ধে বাংলা ছন্দকে পয়ার, ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিন ছন্দের ধ্বনিগত বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়নি তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথ পয়ারকে সাধু ভাষার ছন্দ, স্বরবৃত্তকে খাঁটি বাংলা ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্তকে সংস্কৃতানুসারী ছন্দ বলেছেন। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দ-বিশেষত্ব আলোচনার ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করেছেন উদাহরণ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মতে পয়ার ছন্দে সব ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

ভারতচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)-র কবিতার উদাহরণ দিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের ‘পরিশেষ’ কাব্যের উল্লেখ করে বুদ্ধদেব এ মত খণ্ডন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে স্বরবৃত্ত ছন্দে সব ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব এবং প্রমাণ হিসেবে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ -র সূচনার কয়েক পঙক্তি এ ছন্দে লিখেছেন। প্রবোধচন্দ্রের সমর্থন সত্ত্বেও এর প্রতিবাদ করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে কাব্যরস অনুযায়ী ছন্দ প্রযুক্ত হয়। এর ব্যতিক্রম হলে বিনষ্ট হয় কাব্যগুণ।

ধ্বনি বিচার করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে দুই মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দ বা পয়ার জাতীয় ছন্দ, তিন মাত্রার অসমমাত্রিক ছন্দ বা মাত্রাবৃত্ত এবং দুই তিন মাত্রার বিষমমাত্রিক ছন্দ – এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। স্বরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ তিন মাত্রার ছন্দ বলেছেন এবং “ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে তিন মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তকে একই ছন্দের সাধু ও প্রাকৃত রূপ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন পয়ার কোনো পৃথক ছন্দ নয় - ছন্দোবন্ধ বা ছন্দের একটি বিশেষ রূপ। বুদ্ধদেব বসু যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তার এ মত গ্রহণীয় নয়। বুদ্ধদেবের এ মত সঠিক; কারণ মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত দুটি পৃথক ছন্দ এবং পয়ার ছন্দোবন্ধ নয় স্বাধীন একটি ছন্দ।

প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দের প্রধান তিন ভাগের নাম যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে এই নামগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে মাত্রাবৃত্তকে তিন মাত্রার ছন্দ, স্বরবৃত্তকে ছড়ার ছন্দ আর যৌগিক ছন্দকে পয়ার নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ তার ফলে ছন্দ তিনটির প্রকৃতি সহজে বোঝা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু আলোচনা করেছেন যতিমাত্রিক বাংলা ছন্দে মুক্ত যতি প্রবহমানতার প্রয়োগ বিষয়ে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই পঙক্তি-অতিক্রমী প্রবহমানতার সূচনা। গিরিশচন্দ্রের নাটকে আর রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতায় অসম পঙক্তির প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। প্রবোধচন্দ্র এ ছন্দের নাম দিয়েছেন ‘মুক্তক’ এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পয়ার ও স্বরবৃত্তে মুক্তক অধিক ব্যবহৃত হয়, মাত্রাবৃত্তে কম। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র দু জনেই বলেন মাত্রা ছিল মনের যতিপাত কঠিন। রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতি" (১৯৩৮)-র ‘যাবার মুখে', বিষ্ণু দে-র ‘চোরাবালি' (১৯৩৭) – ‘মন দেওয়া-নেওয়া’ এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭)-

র নাম-কবিতা ও 'কবিতা' শীর্ষক কবিতাটি মুক্তক মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ। বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের পুর্বেই এ ছন্দ কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। এ ছন্দ প্রয়োগের ব্যর্থতা হিসেবে বুদ্ধদেব বসু মণীন্দ্র রায়ের (১৯১৯-২০০০) ছায়া সহচর সংকলনের দুটি কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু স্বরবৃত্ত ছন্দকে চার সিলেবল-এ ভাগ করা সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের মতের। সমালোচনা করেছেন। তার মতে স্বরবৃত্ত পাঁচ বা তিন সিলেবল-এরও হয়। বিশেষত উচ্চারণ প্রস্বর বর্জিত বলে বাংলা ভাষায় সিলেবল বা দলভিত্তিক ছন্দ গণনা কঠিন।

সপ্তম অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নির্মিত চতুর্থ একটি বাংলা ছন্দের কথা। পয়ারের মতো গঠন হলেও এ ছন্দে যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্তের মতো দু মাত্রার হয়। প্রবোধচন্দ্র এ ছন্দকে বলেছেন মাত্রিক পয়ার। কারণ তিনি পয়ারকে চোদ্দো মাত্রার ছন্দোবন্ধ মনে করে যৌগিক, মাত্রিক ও স্বরবৃত্ত —এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। পয়ার ছন্দোবদ্ধ নয় এবং স্বরবৃত্ত পয়ার হয় না। তাঁর এ বিভাগ তাই যথার্থ নয়।

হসন্ত-প্রধান, প্রায় যুক্তবর্ণহীন ও যুক্তবর্ণ-প্রধান- মাত্রিক ছন্দের এইসব রূপ বাংলা কবিতার ছন্দে দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) কবিতায় লক্ষিত হয় প্রথম রূপের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে করেছেন যুক্তবর্ণ-প্রধান।

এ প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু রিদম বা ছদস্পন্দ এবং গদ্য ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে ছন্দস্পন্দ ছন্দের প্রাণ। ভাবানুসারী ছন্দস্পন্দের অভাবে মাত্রানির্ভর ছন্দে লেখা কবিতাও যথার্থ কবিতা হতে পারে না। এই ভাবানুসারী ছন্দস্পন্দের জন্য কবি রচনা করেন গদ্য ছন্দের কবিতা।

প্রবোধচন্দ্র এ ছন্দকে বলেছেন গদ্যগন্ধী কবিতা। বুদ্ধদেব তার এই মত গ্রহণ করেননি। তার মতে গদ্য কবিতা বিশুদ্ধ গদ্য। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কিছু কবিতা এ ছন্দে রচনা করেন। গদ্য কবিতায় ভাবের অনুরোধে অনেক সময় এসে যায় পদ্যের

আভাস। এভাবেই সৃষ্টি হয় ফ্রি ভার্স। প্রবোধচন্দ্র ফ্রি ভার্স নিয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে রবীন্দ্রনাথ একদা কোনো ফরাসি অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তিনি রচনা করেছেন অনেক ফ্রি ভার্স। তথ্যটি ঠিক নয়। ফ্রি ভার্সকে মুক্তক বলা যায় না। এতে ছন্দ ব্যবহার বিষয়ে থাকে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধে, তিনটি নৃত্যনাট্যে এবং 'স্ফুলিঙ্গ' (১৯৪৫)-এর কোনো কোনো কবিতায় এই মিশ্র ছন্দের ব্যবহার আছে। কয়েকজন আধুনিক কবি এ ছন্দে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন। তবে এ ছন্দের সুস্পষ্ট ও পরিণত ব্যবহার বাংলা কবিতায় দেখা যায় না বললেই হয়।

'সাহিত্যচর্চা' সংকলনের '২' চিহ্নিত ভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'। চার অধ্যায়ের মিতকায় এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সমকালের বাঙালি কবিদের সাধারণ বিশেষত্ব আলোচিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বিশ শতকের প্রথম পর্বের তরুণ বাঙালি কবিগণের সাধ্য ছিল না রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রমের। রবীন্দ্রনাথের অনন্য কবিপ্রতিভার অনুসরণ বা অনুকরণের শক্তি ছিল না তাদের। তাই এঁদের কবিতায় দেখা গেল স্বভাব কবি সদৃশ আবেগের মার্জনাহীন, শাসনবিহীন প্রকাশ আর গঠন-শিথিলতা। এদের মধ্যে আছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৫৮-৪৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই কবিবৃন্দ রবীন্দ্র-প্রভাবের অনতিক্রম্যতা সম্পর্কে পরবর্তী কবিদের সচেতন করে দিয়েছেন। এখানেই এঁদের গুরুত্ব।

বুদ্ধদেব বসুর মতে কবিতার বিষয় আর প্রকরণ উভয় দিকেই ছিল রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ অধিকার। তদুপরি ছিল অনুভবের স্বচ্ছ রূপদানের দক্ষতা। এই সহজতায় মুগ্ধ তৎকালীন কবিগণ ভেবেছিলেন অনুভবের আয়াসহীন প্রকাশই কবিত্ব। তাই তাদের কবিতায় নিজস্বতা অনুপস্থিত।

বুদ্ধদেব বসু এই কবিদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। কারণ রবীন্দ্র অনুসরণ সত্ত্বেও তার রচনা কিছুটা স্বতন্ত্র এবং রচনাশক্তির দিক দিয়েও তিনি সমকালের অন্য কবিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতোই বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য, গ্রামচিত্র প্রকৃতি এবং দেশপ্রীতি। কিন্তু আবেগগভীরতার যথার্থ রূপায়ণের ক্ষমতা তার নেই। গভীর আবেগের বলিষ্ঠ কাব্য রূপদানেই রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট। রবীন্দ্র-কবিতায় ছন্দের যে মাধুর্য আর সংযমের দিকটি লক্ষিত হয় তা সত্যেন্দ্র-কবিতায় অনুপস্থিত। শ্রুতিরম্যতাই সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের একমাত্র গুণ। এই দুই কারণে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ। করলেও মুগ্ধ করতে পারে না।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রেম কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। সত্যেন্দ্রনাথও তাকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছেন। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি বিশিষ্ট। কিন্তু সে প্রাচুর্যকে সংযতভাবে কবিতায় রূপ দিতে পারেননি নজরুল। বুদ্ধদেব বসুর মতে নজরুলের কবিতায় ক্রমপরিণতি নেই। বরাবর তিনি একইভাবে লিখে গেছেন কবিতা।

তবে ধর্মের ভিন্নতা, মফস্সলের কৈশোর-জীবন, জীবিকা-বৈচিত্র্য, সৈনিকবৃত্তি – নজরুলের স্বভাবজ প্রবণতাকে করেছিল আরও ক্ষমতাবান। এ সব কারণে স্থায়িত্বগুণের অভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হয়ে ভিন্ন পথে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন নজরুল। তাঁর প্রদর্শিত পথেই সম্ভব হয়েছিল মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) কবিতার প্রকরণ-বলিষ্ঠতা আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮০-১৯৫২) কবিতার অনুভব-ভিন্নতার রূপায়ণ। বাংলা সাহিত্যে নতুন দিকের সূচনাকারী 'কল্লোল' গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের পটভূমি নজরুলই অনেকটা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন কবিতা অপেক্ষা পারস্য দেশীয় গজল গীতি-সংরূপের বাংলা রূপদান, গান রচনা আর সুর সংযোজনাতে নজরুলের প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমের সচেতন প্রয়াস নেই। তার পরের যুগে দেখা গেল সেই সচেতনতা।

এর পরের যুগে দেখা দিলেন একদল নতুন কবি। রবীন্দ্র-কবিতার মুগ্ধ পাঠক এই কবিগণ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব পথ খুঁজে নিতে সচেষ্ট হলেন। এঁদের রচনার মধ্যে ছিল সাহিত্য নির্মাণ ও বিষাগত ভিন্নতা। রবীন্দ্র-রচনা থেকে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যেই ছিল তাদের মিল।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে; বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে ব্যবহার করে, অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) বিষয় ও প্রকরণ-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন অনুসরণ নয়; শ্রমসাধ্য নির্মাণ ক্ষমতা প্রকৃত কবিতা রচনার ভিত্তি।।

এভাবেই নজরুল ইসলামের স্বাতন্ত্র-সাধনা পরিণতি লাভ করল। বাংলা কবিতা সতর্ক বুদ্ধি আর তীব্র আবেগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করল। বক্তব্যের ব্যাপ্ত মহিমা, প্রকরণের স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফুর্ততায় আধুনিক কবিরা বাংলা কবিতাকে নতুন আর সমৃদ্ধ করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তার উত্তরসাধকদের কাছে হয়ে উঠলেন অপরিহার্য অনুপ্রেরণা-উৎস।

‘রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা সাহিত্যচর্চার ‘২’ সংখ্যক গুচ্ছের শেষ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-জীবনী রচনা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার সঠিক পথ খুঁজেছেন মূলত অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) এবং প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) -র রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থের প্রেক্ষিতে। অজিতকুমারের গ্রন্থের নাম না থাকলেও মনে হয় তার 'রবীন্দ্রনাথ’ (১৯১২) গ্রন্থটিই আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রভাতকুমারের গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক’ (১ম খণ্ড, ১৩৪০, ২য় খণ্ড, ১৩৪৩ব.)-এর দুটি খণ্ড এবং প্রমথনাথ বিশীর ‘রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর’ (১৩৫তব.) – এই তিন গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধটি।

বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রজীবনী রচনা ও তার সাহিত্য সমালোচনার দুটি প্রধান বাধা (১) কবির স্ব লিখিত আত্মজীবনী ও সাহিত্য-ব্যাখ্যা (২) রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় ঘটনাহীন

ধীরগতি জীবন। তা ছাড়া আছে উজ্জ্বল পরিবারপ্রেক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য জনিত বাধা।

উল্লিখিত তিন গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ করেছিলেন নিবিড়ভাবে। তথাপি এই তিন রবীন্দ্র অনুরাগী যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্রজীবনী রচনা ও তার সাহিত্য আলোচনার চেষ্টা করেছেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তাঁর সাহিত্য আলোচনায় ব্রতী হন। রবীন্দ্র সাহিত্যে চিরন্তন আদর্শের প্রেক্ষিত সন্ধান, ব্যাপ্ত বিশ্ববোধের অনুভব এবং কবির জীবন ও সাহিত্যের পরস্পর সাপেক্ষতা সন্ধান তাঁর রচনার বিশেষত্ব।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবন আর বিচিত্র বিস্তৃত সাহিত্য-জীবনের অনুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবার-প্রেক্ষিতের পূর্ণ পরিচয় দান আর রবীন্দ্র-রচনার দুর্বলতা আলোচনা এ গ্রন্থের বিশেষত্ব।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর'(১৩৫তব) এ অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতো কবিজীবন ও সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো জোর দিয়েছেন এ কৈশোর ও সে সময়ের রচনার উপর। কবিতা ও কবির প্রেক্ষিতকে অধিক গুরুত্বদান এ গ্রন্থের ত্রুটি।

বুদ্ধদেব বসুর মতে প্রকৃত জীবনী-লেখক হবেন আসক্তিহীন মন, এবং তথ্য নির্বাচন ও পরিবেশন ক্ষমতার অধিকারী। এ জন্য চাই সময়ের ব্যবধান। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বাতিশয়ী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনী রচনার জন্য তা অত্যাবশ্যক। তাই রবীন্দ্রনাথের ১৯৪৭-এ রচিত প্রবন্ধের সমাপ্তিতে এই আশাই ব্যক্ত করেছেন লেখক।

সাহিত্যচচা'-র ৩" চিহ্নিত শেষ গুচ্ছে আছে সাহিত্য সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ। সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্পীর স্বাধীনতা। দুটি প্রবন্ধের কেনোটিতেই সংখ্যা-নির্দিষ্ট অধ্যায় বিন্যাস লাক্ষিত হয় না।

'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে সংবাদপত্রের সংবাদ, সমকালীনতা আর সাহিত্য এদের সম্পর্কের দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের আছে ভালো ও মন্দ দুটি দিক। মুদ্রাযন্ত্র তার প্রমাণ। মুদ্রাযন্ত্র এনেছে সংবাদপত্র – যার মুখ্য কাজ সংবাদ পরিবেশন। কিন্তু ক্রমে সংবাদপত্র হয়ে উঠেছে সাক্ষর জনমনের একমাত্র অবলম্বন। সাহিত্য হয়েছে উপেক্ষিত।

মানুষের সংবাদ-তৃষা আগে মিটত হাট, জলের ঘাট, চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা আর মদের দোকানে সমবেত জনগণের মৌখিক আলাপে ব্যক্ত খবরে। পরচর্চাভিত্তিক এসব সংবাদের বেশিরভাগই হত মিথ্যা। আধুনিক সংবাদপত্রে দেখা যায় এরই ঈষৎ উন্নত সংস্করণ।

সংবাদ, মন্তব্য, বিজ্ঞাপন - সংবাদপত্রের এই তিন বিভাগের কোনোটিতেই থাকে না প্রকৃত সত্য। বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল-উপদলের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে সংগৃহীত সংবাদ বেছে নিয়ে বিশেষভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয় সংবাদপত্রে। এভাবে হয় সত্যের প্রাথমিক বিকৃতি। সম্পাদকীয় মন্তব্যে মুদ্রিত সংবাদের সমর্থন দ্বারা দ্বিতীয়বার খণ্ডিত হয় সত্য। বিজ্ঞাপনে প্রাধান্য পায় মিথ্যা।

বুদ্ধদেব বিজ্ঞাপনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন - (১) তথ্য ও সিদ্ধান্ত – দুটিই সঠিক এমন বিজ্ঞাপন, (২) ভ্রান্ত তথ্য অথচ মত সত্য – এমন বিজ্ঞাপন (৩) অভ্রান্ত তথ্য ও মিথ্যা সিদ্ধান্ত প্রদান। বিজ্ঞাপন, (৪) তথা ও মীমাংসা দুটিই মিথ্যা – এমন বিজ্ঞাপন। প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির বিজ্ঞাপন বেশি প্রকাশিত হয় না: দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের বিজ্ঞাপন অধিক দেখা যায়। বর্তমান পাঠ-সক্ষম জনতা সংবাদপত্রের। সংবাদ ও বিজ্ঞাপন ভিন্ন অন্য কোনো কিছু পড়ে না এবং পঠিত বিষয়কে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। মৌখিক সংবাদের ভ্রম সম্পর্কে সে সময় মানুষ সচেতন ছিল। তাদের বিশ্বাসের উৎস ছিল ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্য।

কিছু মানুষ সংবাদপত্রের সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের অ-সত্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। কিন্তু তথ্যপরিবেশন নৈপুণ্য সে অবিশ্বাস মুছে দেয়। বস্তুত সংবাদপত্র তথ্য প্রকাশ করে, তথ্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে না। পরিণামে মানুষও আজ সত্যের পরিবর্তে তথ্য সম্বন্ধেই হয়ে উঠেছে আগ্রহী।

সংক্ষেপে বলা যায় নির্বাচিত সংবাদ প্রকাশ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সংবাদ নির্বাচন; সংবাদ বিশ্লেষণ না করা – সংবাদপত্রের প্রাথমিক দোষ। আর তথ্যস্পৃহার বৃদ্ধির দ্বারা সাহিত্যরস এবং সমগ্রের অখণ্ডিত রস-উপভোগ-ক্ষমতার ক্রমাবলুপ্তি ঘটানো সংবাদপত্রের পরোক্ষ দোষ। রাজনীতি, সমাজবিধি, বিজ্ঞান বিষয়ক সকল গণপাঠ্য পুস্তক ও পত্রিকার বাহুল্য সেই ত্রুটির প্রমাণ। কারণ এসবই মানুষের তথ্যপ্রিয়তা ও তথ্য-তাৎপর্য সন্ধানে অনীহার প্রমাণ।

জনতার এই তথ্যপ্রীতি সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ফলে সাহিত্য হয়ে ওঠে তথ্যবহুল ছদ্ম ইতিহাস।

মুদ্রাযন্ত্র পদ্যের পরিবর্তে গদ্যকে করেছিল সর্ব বিদ্যার বাহক। গদ্য সাহিত্যেও দেখা দিয়েছিল ছোটো গল্প, উপন্যাস, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ – বিবিধ সংরূপ। আবার মুদ্রাযন্ত্রই মানবমনকে করে তুলেছে। সংবাদপত্রনির্ভর এবং তথ্যসন্ধিৎসু। ফলে সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্য হয়ে উঠছে ইতিহাস। সাহিত্যিক সমাজ-বিচ্ছিন্ন নন। তাই সাহিত্যে সমকালের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। এই সাময়িকতা পার হয়ে চিরন্তনের রূপনির্মাণই সাহিত্যকে করে তোলে সার্থক। তাই ল্যাংল্যান্ড (William Langland; ১৩২৭- ১৪০০) এর তুলনায় চসার (Geoffrey Chaucer : ১৩৪০-১৪০০), কিপলিং (Rudyard Kipling ১৮৬৫-১৯৩৬)-এর তুলনায় ইয়েটস (William Butler Yeats : ১৮৬৫-১৯৩৯) বড়ো সাহিত্যিক হতে পেরেছেন। অবশ্য মহৎ সাহিত্যিক অনায়াসে সমকালীনতা অবলম্বন করেও চিরন্তনত্বের রূপদানে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক কবিতা তার প্রমাণ। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম অতি বিরল।

প্রাত্যহিক সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ অপ্রয়োজনীয় নয়। সংবাদপত্র, পত্রিকা আর গণপাঠ্য পুস্তক অবশ্যই সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করে পূর্ণ করবে মানুষের তথ্যতৃষ্ণার অনিবার্য দাবি। কিন্তু সাহিত্য কদাপি সংবাদ নির্ভর হবে না। সাহিত্যিকের উপলব্ধির রূপায়ণই সাহিত্য। সমকালীন তথ্য সেখানে অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তা কখনই প্রবল হয়ে উঠবে না। তথ্য অবলম্বন করে তাকে ছাপিয়ে যাওয়াই সাহিত্যের লক্ষ্য। সাহিত্যিকের

উপলব্ধির মাধ্যমে ঘটনা হয়ে ওঠে সাহিত্য। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সাহিত্য হবে ইতিহাস।

অর্থাৎ সংবাদ, তথ্য আর সাহিত্য – তিনের মধ্যে রয়েছে সংযোগ। তথ্য বা সংবাদ কিন্তু স্বরূপেই সার্থক। তাদের বাহুল্য সাহিত্যকে স্বধর্ম-চ্যুত করে।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' সাহিত্যচর্চার '৩' চিহ্নিত গুচ্ছের শেষ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে রচনা সময়ের ছাপ স্পষ্ট। ১৯৫২-তে লেখা প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির শক্তিকে কোনো দল বা মতের বাঁধনে বাঁধা যায় না। তিনি যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে বিশদ করেছেন আপন মত।

শিল্পীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সাধারণত উপস্থাপিত হয় তিনটি যুক্তি (১) স্বাধীনতা অলীক বস্তু। কারণ প্রতি ব্যক্তিই শরীর ও সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ। (২) যন্ত্রনির্ভর আধুনিক যুগে বাক্তি-স্বাধীনতাকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেন কিছু মানুষ। (৩) কেউ কেউ মনে করেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বর্তমানে তা ত্যাগ করে স্বাধীনতা-শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামই কর্তব্য।

বুদ্ধদেব অস্বীকার করেন না যে মানুষ বলেই দেহগত আর সমাজবদনে শিল্পী থাকেন বন্দি। সেই সমাজজীবন আর সমকাল থেকে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে তিনি শিল্প সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু একক এবং অনন্য। বাস্তব জগৎ থেকে দূরে গিয়ে তিনি তাকে আসক্তিহীন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। তার সেই দেখার শক্তিতে শিল্প হয়ে ওঠে বিশ্ব ও মানবজাতিকে চিনে নেওয়ার মাধ্যম। বস্তুবিশ্ব থেকে এই অপসৃত হওয়ার ক্ষমতাই শিল্পীর স্বাধীনতা। সমাজ আর স্বকালে বদ্ধ শিল্পী ঘটনাধারার কোন ক্ষণটি নির্বাচন করবেন, মানুষের কী রূপ ফুটে উঠবে তার শিল্পে – তা তাঁর একান্ত নিজস্ব চিন্তার বিষয়। এক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতার বিনাশ আসলে শিল্পীর ধ্বংস।

শিল্পীর সত্তার আত্মপ্রকাশের তাড়নায় শিল্পের জন্ম। এজন্য সত্তার গভীরে মগ্ন হয়ে তিনি আবিষ্কার করেন আপন অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি; তাদের ব্যবহার করে গড়ে তোলেন শিল্প। এই মগ্নতা আর নির্মাণের মুহূর্তে বাইরের কোনো শাসন তার উপর

প্রয়োগ করা যায় না – তা করা অসম্ভব। শিল্পীর স্বাধীনতা আসলে তার শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কেউ কেড়েও নিতে পারে না – কেউ তাকে দানও করতে পারে না।

শিল্পীকে কোনো মতবাদের বন্ধনে বাঁধা যায় না। যদি নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ তিনি গ্রহণ করেন তবে তার শিল্পসৃষ্টি সেই মতবাদের আকারে গড়ে ওঠে। ফলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কিছু মানুষ হয় তার লক্ষ্য – সমগ্র মানবজাতি নয়। ফলে শিল্পীমানস হয়ে যায় বিকৃত।

প্রবন্ধ রচনার সময় ১৯৫২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে তখন মার্কসবাদ, মার্কিন মতবাদ, ক্যাথলিক ধর্ম অনুসারী মতবাদ হয়ে উঠেছে প্রবল। সেই সব মতের কোনো কোনোটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বহু ব্যক্তি এবং স্ব স্ব মতবাদকে চরম সত্য বলে প্রচার করে অন্যদের সে মত গ্রহণে প্ররোচিত করছেন তারা। ফলে তাদের রচনা হয়ে উঠছে একবর্ণ, একমাত্রিক। মানবজীবনের বিচিত্র রূপের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে শিল্পকে গ্রহণ করা হচ্ছে না। পরিণামে শিল্প হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।

ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনো মতবাদ তেমন প্রধান হয়ে ওঠেনি কোনো সময়। এদেশে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সমন্বয়ের মনোভাবই ছিল প্রধান। রবীন্দ্রনাথ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তবে উত্তাল মতবাদ-প্রাধান্যের এই যুগে ভারতীয় শিল্পীগণও বাঁধা পড়ছেন মতের ঘেরাটোপে। বিপন্ন সময়ে ক্ষণকালের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে মতবাদ। কিন্তু তার ফলে চলে যায় চিন্তা-স্বাধীনতা আর চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশক্তি। তাই মতবাদ কখনই হতে পারে না চিরকালের আশ্রয়।

শিল্পী জাগ্রত বুদ্ধি আর সংবেদনশীল মন দিয়ে সমগ্র জীবনকে অনুভব করেন। সব বিরোধ মিটিয়ে সকল বিপরীতকে মিলিয়ে দিয়ে চিরন্তন কল্যাণ-ধারণাকে পূর্ণতা দেয় শিল্পীর মন। এই পূর্ণতা লাভের কঠিন সাধনার জন্য প্রয়াোজন শিল্পীর স্বাধীনতা। আদর্শকে খণ্ডিত করে সহজলভ্য করে দেয় মতবাদ। এ জন্য তা সফল হতে পারে না।

কঠিন আদর্শের কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা খুঁজে পায় চিরকালীন কল্যাণ-প্রাপ্তির পথ। এখানেই তার স্বাধীনতার মূল্য এবং সার্থকতা।

৯.৬ অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন

১। বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যজীবনের পরিচয় দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

২। 'সাহিত্যচর্চা'-সংকলনের প্রবন্ধসমূহের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। 'সাহিত্যচর্চা'-সংকলনের প্রবন্ধগুলি মোট কয়টি গুচ্ছে বিন্যস্ত হয়েছে? যে কোনো একটি গুচ্ছের প্রবন্ধসমূহের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করুন।

মাঝারি প্রশ্ন

১। সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য - সাহিত্যচর্চা'-র কোন ভাগের অন্তর্ভুক্ত? প্রবন্ধটির বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

২। বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি সাহিত্যচর্চার কোন গুচ্ছের অন্তর্গত? প্রবন্ধটির বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে লিপিবদ্ধ করুন।

৪। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগের সার্থক ভাষাশিল্পী। - মন্তব্যটি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ সুদক্ষিণা -বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭

দাস প্রভাতকুমার—কবিতা পত্রিকা সূচিগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু আমাদের কবিতাভবন, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১

বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসু আমার যৌবন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৯

বসু সুদীপ বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

একক ১০ - সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা

বিন্যাসক্রম

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ 'রামায়ণ'

১০.৩ বাংলা শিশুসাহিত্য

১০.৪ সাহিত্যচর্চা

১০.৫ ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে ব্যক্ত লেখক-মনোভঙ্গি আলোচনা

১০.৬ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মননে ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’

১০.৭ ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে ব্যক্ত বুদ্ধদেব বসুর অভিমত বিশ্লেষণ

১০.৮ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর অবস্থান: সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

বুদ্ধদেব বসুর ‘সাহিত্যচর্চা’ সংকলনের তিনটি প্রবন্ধ পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট। প্রবন্ধ তিনটি আছে এই সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে। ‘রামায়ণ’, ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ – তিনটি পাঠ্য - প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে এই এককটিতে। সঙ্গে আছে প্রবন্ধত্রয়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণ। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর রচনাবৈশিষ্ট্যও এ অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই এককটির উদ্দেশ্য পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সম্যক অবহিত করানো। মূল পাঠ্যের নিবিড় পাঠেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। সেই গভীর পাঠের সুযোগ লাভে দুরত্ব যাতে বাধা না হয় সেই উদ্দেশ্য পূরণের দিকে লক্ষ রেখে এই পাঠ বিশ্লেষণটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মনে রাখতে একই সঙ্গে মূল পাঠ্য প্রবন্ধ। তিনটি পড়ে নিতে হবে গুরুত্ব দিয়েই।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ – যাবতীয় সাহিত্য-রূপবন্ধেই লেখক-মানসের প্রতিফলন লক্ষিত হয়। তুলনায় যুক্তিতথ্য-নির্ভর প্রবন্ধে স্রষ্টার মানস প্রতিবিম্বন কতকটা কম। বিষয়ের উপস্থাপন আর ব্যাখ্যাভঙ্গিতে ধরা পড়ে লেখকের মনোভঙ্গি। 'রামায়ণ', 'বাংলা শিশুসাহিত্য’ আর ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক প্রবন্ধ এয় বুদ্ধদেব বসুর মনোাভাবের কোন কোন দিকের বাহক তার বিশ্লেষণ করাও বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে থাকবে তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্বের আলোচনা। কারণ বুদ্ধদেব বসু বিশ শতকের সেই সব প্রাবন্ধিকের মধ্যে পড়েন যাঁদের রচনায় তন্ময়তার সঙ্গে মিশে গেছে মন্ময়তা। প্রবন্ধ-বিম্বিত মনোভাব তাদের সেই বিশেষত্বের দিকটি স্পষ্ট করে দেয়। একারণেই প্রবন্ধ-বিবৃত মনোভাব বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাবন্ধিকের রচনার সাধারণ বিশেষত্ব সম্পর্কিত আলোচনা।

এককটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মননের, চিন্তনশক্তির তথা সাহিত্য-বিশ্লেষণ শক্তির পরিপুষ্টি সাধনের পথনির্দেশ। সাহিত্য-শিক্ষার্থীর পক্ষে আবশ্যিক এই মনন-উদ্দীপন। এ শক্তির বিকাশের ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে পাঠ্যবস্ত্র বিচারের ক্ষমতা লাভ

করে – যা তার ভবিষ্য-রচনাশক্তির পরিস্ফুটনের ভিত্তি। কেবলমাত্র পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নয় - রচনা ক্ষমতার সম্যক বিকাশই সাহিত্য-শিক্ষার্থীর মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সহায়তার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে এই এককটি।

কিছু প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার

১০.২ 'রামায়ণ'

সাহিত্যচর্চা'-র '১' গুচ্ছের প্রথম প্রবন্ধ রামায়ণ। ছয় অধ্যায়ের এই প্রবন্ধের সূচনায় আছে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর বালক বয়সে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১১) পাঠের স্মৃতি। কবিতায় রচিত এই রামায়ণে তিনি পেয়েছিলেন কাব্যরসের স্বাদ।

এরপরে আরও বড়ো বয়সে কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ণ পড়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সে রামায়ণ তার ভালো লেগেছিল কিন্তু মুগ্ধ করেনি তাঁর মনকে। পরে তিনি কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি-রামায়ণের তুলনা করেছেন। তার এ মত যথার্থ যে কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেননি। তিনি রামায়ণের চরিত্র আর পরিবেশ ও মানসিকতাকে পুরোপুরি বাঙালি করে তুলেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের যে সব অংশ বাঙালি মনকে। আহত করতে পারে এমন অংশগুলি তিনি সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। ফলে তার কাব্য হয়েছে নতুন সৃষ্টি। বাল্মীকি-রামায়ণ আদি মহাকাব্য। আদি মহাকাব্যে সব সময়ই দেখা যায় নিমর্ম বাস্তবের নিরাসক্ত রূপায়ণ। মহাকাব্য জীবনের চরম সত্যের রূপ নির্মাণ। ট্র্যাজেডির ভীষণতা, কমেডির আনন্দ-উচ্ছাস মহাকাব্যে থাকে না ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষার রূপভেদ। মানব-স্বভাবের মন্দ আর ভালোকে সমভাবে উপস্থাপন করে মহাকাব্য। জীবন আর জীবনদর্শনের পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় মহাকাব্যে। জটিলতা নয় – সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা মহাকাব্যের বিশেষত্ব। তার উত্তম দৃষ্টান্ত মহাভারত। বাল্মীকি-রামায়ণে জীবনদর্শনের বিস্তৃতি তুলনায় কম। কিন্তু কাহিনির সংহতি আর কাব্যগুণের বিচারে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা সমৃদ্ধ।

বাল্মীকি-রামায়ণের রস উপভোগের অন্তরায় এর রচনা-মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা। রাজশেখর বসু (১৮৮০- ১৯৬০) বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ (১৯৪৬) করে দূর করেছেন সেই অন্তরায়। একই সঙ্গে হাস্যরসিক, বিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী এবং ভাষাশিল্পীর সম্মিলন ঘটেছে তার মধ্যে। ফলে তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণের সরল এবং সুপাঠ্য সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করা। তার অনুবাদ পাদটীকা ভারাক্রান্ত নয়। ভূমিকাও নয় বৃহৎ । প্রয়োজনমতো মূল থেকে কিছু শ্লোক তিনি অনুবাদ সহ সংযোজন করেছেন। সেগুলির মধ্যে কাব্যরসসহজ ও নাট্য গুণ সম্পন্ন এবং রামের চরিত্র-বিশেষ প্রকাশের সহায়ক কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের বর্ষা ও শরতের প্রকৃতিশোভা বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি অন্যতম। বুদ্ধদেব বসুর মতে বনবাস-দুঃখ, সীতাহরণের বেদনা, আসন্ন বালীবধের উত্তেজক মুহূর্ত আর লঙ্কা যুদ্ধের মধ্যে এই সময়টিতে রাম গেয়েছেন একটু অবসর। সীতা-বিরহ তাঁর মনকে সম্পূর্ণ চুর্ণ করে দেয়নি। তাই তিনি উপভোগ করতে পারছেন প্রকৃতির রূপ। শিল্পীর মতো তিনি সে সৌন্দর্যকে আস্বাদন করছেন। দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনের এই প্রথম অবসর তিনি নিস্থল হাহাকারে ব্যয় করলেন না। এখানেই রামের চরিত্র-বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে বাল্মীকি নিসর্গ-সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য বেছে নিয়েছেন এই সময়। লক্ষ্মণ চরিত্রে এই গভীরতা নেই। তাঁর মন সীতা-উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন। মনোভাব সংযমে নিপুণ রাম তাকে দেখিয়েছেন প্রকৃতির বর্ষা ও শরতের রূপ-বিভিন্নতা।

'মেঘদূত' কাব্যের যক্ষ বিরহকে প্রিয়ার চিন্তা দিয়ে পূর্ণ করেছে। রাম তার চেয়ে অধিক বিচ্ছেদবেদনা বহন করেছেন নিজের মধ্যে, তথাপি তিনি ব্যাকুল নন। মহাকবির বলিষ্ঠ লেখনীর পক্ষেই এই সংযত প্রশান্তির ধীর উপস্থাপন সম্ভব। কারণ সেই সংযমই যথার্থই সত্য। যক্ষের বিরহ কবি-কল্পনার সংলগ্নতার কারণে হয়ে উঠেছে বর্ণময়। সত্যকে সেখানে কবি নিরাসক্তভাবে উপস্থাপিত করতে পারেননি। এখানেই মহাকাব্য ও পরবর্তী যুগের কাব্যের মধ্যে প্রভেদ।

প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু উদাহরণ দিয়ে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের সম-সময় ও মানসিকতার প্রভেদ বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাল্মীকি সত্যকে সরলভাবে ভাষারূপ

দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সব রকমের মাংস ও সুরা উপভোগ করতেন। সে সময়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না এর ব্যতিক্রম। রাম-সন্ধানে আশ্রমে-আগত ভরতের সৈন্যদলের আপ্যায়নের জন্য ঋষি ভরদ্বাজ তাই মাংস-সুরা-নারী সহ বিবিধ ভোগেপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। আর কৃত্তিবাস এ স্থানে কেবল নিরামিষ অন্ন, সুস্বাদ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ আর স্বর্ণময় পাত্রাদির কথাই লিখেছেন। রাজসৈন্যের আপ্যায়নের রাজকীয়তা সে বর্ণনায় অনুপস্থিত। বোঝা যায় পার্থিব সুখ উপভোগে অভ্যস্ত প্রাচীন ভারতীয় জীবনের রূপ চিত্রণে পটু ছিলেন বাল্মীকি। আর কৃত্তিবাস বাঙালি মনের সকল বিশেষত্বকেই রূপ দিয়েছেন তার রামায়ণে। তাই বাল্মীকির সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু রামচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথকৃত রাম চরিত্রের বিশ্লেষণ বিবৃত করেছেন। সাহিত্য (১৯০৭) সংকলনের সাহিত্যসৃষ্টি' (আষাঢ়, ১৩১৪ব.) এবং ভিন্ন একটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" (১৩১৮ব) – এই প্রবন্ধ দুটিতে আছে। রবীন্দ্রনাথের করা এই রামায়ণ-ব্যাখ্যা বা রাম চরিত্র বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের মতে রামচন্দ্র অনার্য বালী ও রাবণকে বধ করে রাজ্য দিলেন যথাক্রমে অনার্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে; চণ্ডাল-রাজ গুহক আর বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। এইভাবে ভেদ ও মৈত্রীর কুটনীতি দিয়ে আর্য-অনার্যের পূর্ণ মিলনসাধনের মাধ্যমে রাম ভারতকে করলেন ঐক্যবদ্ধ। এই কঠিন কর্মের জন্য ভারতীয় মন তাকে গ্রহণ করল লোকোত্তর পুরুষ তথা অবতার হিসেবে।

আদর্শ বিশাল সাম্রাজ্যের সফলতম রূপকার হিসেবে রামকে জুলিয়াস সিজার-এর অনুরূপ মহিমান্বিত বলে ভেবেছেন বুদ্ধদেব।

বাল্মীকি-চিত্রিত রামও সুনিপুণ কুটনীতিবিদ। ধর্মনীতির সঙ্গে তিনি কূটনীতিকে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আধুনিক মাপকাঠিতে রাম চরিত্রের বিচার চলে না। রাজশেখর বসু সে কথাই তাঁর বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদের ভূমিকায় বলেছেন। রাজশেখর বসুর

যুক্তি এই যে রাজ্যের জন্য পত্নীত্যাগ আধুনিক মানুষ মানতে পারে না। আবার বহুপত্নীক তৎকালে রামের এক পত্নিব্রত কী বিশাল আদর্শ স্থাপন করেছিল - তাও বুঝবে না এযুগের মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র সে সময়ের সমাজব্যবস্থার মানদণ্ডে বিচার করলে রামকে মনুষ্যত্বের চিরন্তন আদর্শ বলা যায় না। তাকে আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং শত্রু বলে বিচার করা উচিত কিনা এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। রাবণ বধের পর অসংখ্য বানর -ভল্লুক-রাক্ষস সমন্বিত সভায় সীতার প্রতি রামের উক্তি কিছুতে মেনে নিতে পারে না আধুনিক মন। রাম পতিগতপ্রাণ সীতাকে উদ্ধার করেছেন বহু প্রাণের বিনিময়ে, অসীম ক্লেশে। অথচ সেই সীতাকে তিনি বললেন আপন বংশের গৌরব এবং স্বীয় মর্যাদা রক্ষা তার সীতা উদ্ধারের কারণ। রাবণ-হস্তগত সীতার চরিত্রের তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন সীতা তার কাম্য নন। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বিভীষণ, সুগ্রীব – যাকে ইচ্ছা তিনি গ্রহণ করতে পারেন; নাও পারেন।

সীতা তাকে তীব্র তিরস্কারে বিদ্ধ করলেন, বললেন নীচ। অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাকে তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পরে লোকনিন্দার কারণে গর্ভবতী সীতাকে আশ্রম দর্শন করানোর ছলনায় পাঠিয়ে দিলেন বনবাসে। সীতার জন্য তিনি আর দুঃখিত হলেন না, মন দিলেন রাজকর্তব্যে। অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় লব-কুশকে দেখে রামের মনে পড়ল সীতার কথা। তিনি সীতাকে আহ্বান করলেন। তার কথামতো বাল্মীকি সীতাসহ উপস্থিত হলেন সে সভায়। মুনিঋষি, আত্মীয়-পরিজন, ত্রিলোকের সকল অধিবাসীর সামনে সীতাকে নিতে বলা হল পবিত্রতার শপথ। সীতা এবার শপথ করলেন রাম ভিন্ন আর কাউকে মনে স্থান না দিলে পৃথিবী তাকে আশ্রয় দিন। পরিণামে বিদীর্ণ পৃথিবীর গর্ভে আশ্রয় নিলেন সীতা।

রাজশেখর বসু সীতার এই নিগ্রহ মেনে নিতে পারেননি। এবং উত্তরকাণ্ডকে পণ্ডিতমতানুসারে প্রক্ষিপ্ত মনে করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতে উত্তরকাণ্ড ব্যতীত রামায়ণ মহাকাব্য হতে পারত না। সীতার জন্য দুঃখ-কষ্ট-শ্রম স্বীকার করলেন রাম, অথচ সে সীতাকে তিনি আপন ইচ্ছায় ত্যাগ করলেন। এটাই রামায়ণের মূল কথা। কর্মে মানুষের অধিকার, ফলে নয়। তাই পাণ্ডবগণও প্রাপ্তির পরে ত্যাগ করেছিলেন

রাজ্য। রাম ও পাণ্ডবের যুদ্ধ একারণেই ধর্মযুদ্ধ আখ্যা পেয়েছে। নতুবা এই দুই যুদ্ধ হত লুব্ধের সঙ্গে লুব্ধের বীভৎস যুদ্ধ। যুদ্ধের ফল চাননি বলেই রাম ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ শেষে পেয়েছেন চিত্তশুদ্ধির শান্তি।

পঞ্চম অধ্যায়ে রামকে বুদ্ধদেব খানিকটা অবতার পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। কারণ রাম আগেই জানেন তার কর্তব্য কী। তাই তিনি ধৈর্যশীল, শান্ত, কামনাহীন। স্বর্ণমুগের স্বরূপ জেনেও তিনি ব্যস্ত

নন। শান্তভাবে অন্য মৃগ বধ করে মাংস নিয়ে তবে ফেরেন। সীতা উদ্ধারের আয়োজনের আগে বর্ষা আসে; তথাপি অবিচলিত রাম ধীরভাবে চার মাসের কর্মহীনতাকে ঋতুরূপ-উপভোগের উৎস করে তোলেন। শরৎ শেষেও যুদ্ধের জন্য তিনি ব্যগ্র নন। অন্যায় যুদ্ধে বালীকে বধ করেও তিনি অনুতপ্ত নন। এ উদাসীন পবিত্রতা স্বাভাবিক নয়, অ-লৌকিক। যুদ্ধকাণ্ডের পর তাই তিনি সীতাকে বলতে পারেন তার কর্তব্য বলেই এ যুদ্ধ করেছেন; সীতার জন্য নয়। সীতার পাতাল প্রবেশের পর তিনি একবার শুধু শোকে বিহ্বল হন। কিন্তু তারপরেও দীর্ঘসময় রাজত্ব করেন। ভরত ও লক্ষ্মণ-পুত্রদের রাজ্যাংশ প্রদান করেন, ত্যাগ করেন লক্ষ্মণকে। এভাবেই নিজেকে মর্তের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন রাম। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির এমনই করে প্রিয়া। দ্রৌপদী আর চার ভাইকে ছেড়ে যাত্রা করেছিলেন চরম প্রাপ্তির স্বর্গপথে।

বাল্মীকি কিন্তু রামকে মানুষ হিসেবেই এঁকেছেন। সকল দেশের সকল কালের আদর্শ মানুষ তিনি। মানুষ যতটা পবিত্র আর বন্ধনমুক্ত হতে পারে রামচন্দ্র তারই উদাহরণ। মানুষ বলেই স্বর্ণমুগ রূপে মারীচ তাকে ভোলাতে পারে। সাধারণ মানুষের মতোই আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিরপরাধ বালী ও শূদ্র তপস্বী শম্বুককে তিনি হত্যা করেন। প্রথম ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল সুগ্রীবের মৈত্রীলাভ, সীতা উদ্ধার যুদ্ধে সহায়তার জন্য যার দরকার ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ একান্ত যশোলাভের উগ্র কামনায় তিনি করেন নরহত্যা।

এই ত্রুটিগুলি রামকে করেছে সজীব মানুষ। তাই মানুষ তাঁকে নিজের বলে মনে করতে পারে – ঈশ্বরের অবতার বলে দূরে রাখে না।

রামের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিচিত্র রূপ প্রকাশের উপলক্ষ্য রামায়ণ। তাই নারায়ণ-অবতার রামকে সীতা হরণের অপমান সহ্য করতে হয়। প্রতিকূল ঘটনার সামনে তিনি হয়ে যান অসহায়। বালী বধ করে তাকে সুগ্রীবের সহায়তা লাভ করে সংগ্রহ করতে হয় যুদ্ধকৌশল - অনভিজ্ঞ বানর সেনা। এদের নিয়ে ধূর্ত, যুদ্ধনিপুণ রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি উদ্ধার করেন সীতাকে। এইভাবে দুঃখভোগ আর সুখত্যাগের সুদীর্ঘ পথের বাধা পার হয়ে তবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রাম হয়ে ওঠেন চিরকালের আদর্শ মানুষ। এ কারণেই হনুমানের পৃষ্ঠারোহণে লঙ্কা ত্যাগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সীতা। কারণ তাতে ক্ষুণ্ণ হত রামের মহিমা, কাব্য হিসেবে রামায়ণ পেত না সম্পূর্ণতা।।

ষষ্ঠ তথা শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের ঘটনাসমূহের অসংলগ্নতার বিচার করেছেন। এবং এব্যাপারে তিনি অনেক ক্ষেত্রে রাজশেখর বসুর ভূমিকার অনুসরণ করেছেন।

রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি বহু চরিত্রকে উপেক্ষা করেছেন; অনেক চরিত্রকে তিনি করেছেন সংগতিহীন। তাঁর উপেক্ষিত চরিত্রের মধ্যে আছে উর্মিলা, কৈকেয়ী, লক্ষ্মণ। সংগতিহীনতার চরম উদাহরণ বালী-পত্নী তারা। স্বামী বালীর মৃত্যুতে তিনি শোকে বিহ্বল। অথচ তারপরে তিনি সুগ্রীবকে স্বীকার করে নিয়েছেন, জীবনের ভোগ থেকে দূরে সরে থাকেননি।

বুদ্ধদেব বসুর মতে আদি কবি বাল্মীকি আধুনিককালের মতো কৌশলী শিল্পী নন। তিনি অনন্য তার স্বাভাবিক, সহজ সামগ্রিক সত্যদৃষ্টির জন্য। তার বাস্তববোধ সংকীর্ণ নয়। তাই উর্মিলা, লক্ষণ, কৈকেয়ী আমাদের মনে চিরকাল কৌতূহল উদ্রেক করে। এখানেই শিল্পী বাল্মীকির জয়। তিনি নিজেই শুধু রচনা করেন না: পাঠককে দিয়ে রচনা করিয়ে নেন। তাই দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ রামসীতার যুগ্ম জীবনের চিত্র প্রমাণ এত কম। সীতার জন্য রামের ব্যাকুলতা প্রকাশও তেমন নেই। এই কারণেই রামের জন্য সীতার জন্য রামায়ণ-পাঠক চিরকাল দুঃখ বোধ করে; হয়ে ওঠে তাদের মনোবেদনার সমভাগী। বাল্মীকি যদি সব চরিত্রের সফল ভাব ভাষাবদ্ধ করে যেতেন তা হলে

রামায়ণ আধুনিক উপন্যাসের মতো পাঠান্তেই ফুরিয়ে যেত। পাঠকের মনের মধ্যে যুগে যুগে তার যে পুনর্নির্মাণ সেখানেই আদি কবি বাল্মীকির শিল্প-কৌশলের সার্থকতা।

১০.৩ বাংলা শিশুসাহিত্য

'সাহিত্যচর্চা'-র '১' সংখ্যক গুচ্ছের তৃতীয় তথা শেষ প্রবন্ধ 'বাংলা শিশুসাহিত্য'। সাত অধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৫২ সালে। বাংলা শিশুসাহিত্যের শুরু থেকে প্রবন্ধ লেখার সময় – এই কালপর্বে রচিত বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ'-এর মতো এই প্রবন্ধের সূচনা অংশে যুক্ত করেছেন উজ্জ্বল কৈশোরস্মৃতি। এ অংশে মূলত বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি উষার সূচনাকারী কয়েকজন লেখকের রচনা-বৈশিষ্ট্য আর একটি শিশু-কিশোর পত্রিকার বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্য প্রথম থেকে শক্তিমান যে সব লেখকগণের রচনায় পুষ্ট হয়েছিল তাদের মধ্যে আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৮০-১৯৩৭) আর রূপকথার নব রূপদাতা দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭ ১৯৫৭)। আরও আছেন বাংলা কিশোরসাহিত্য যে পরিবারের ঋণ কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবে না সেই রায়চৌধুরী পরিবারের প্রথম কিশোরসাহিত্য-রচয়িতা উপেন্দ্রকিশোর (১৮৬৩-১৯১৫)। তিনি প্রথম ছোটোদের উপযোগী করে লিখেছিলেন রামায়ণ, মহাভারত শুনিয়েছিলেন 'টুনটুনির গল্প' (আসল নাম 'টুনটুনির বই' ১৯১০)। এ সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট কিশোর-সাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০) নতুন করে লিখেছিলেন পুরাণের গল্প আর রবিনহুড (১৯১৪)-এর মতো বহু বিদেশি কাহিনি। সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) রচনা করেছিলেন 'গল্পের বই' (১৯১২) আর 'আরো গল্প' (১৯১৫) নামের অবিস্মরণীয় দুটি গল্প সংগ্রহ।

এর উপর ছিল রঙিন ছবি ভরা মাসিক 'সন্দেশ' (১৯১৩)। আপাত-অর্থহীন ব্যঞ্জনামধুর কৌতুক কবিতা, স্কুল- ছেলেদের নিয়ে লেখা অবিস্মরণীয় গল্পের সঙ্গে উপকথা, পুরাণ-

কথা, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধার সমন্বয়ে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল অপরূপ। পত্রিকাটির বেশির ভাগ রচনারই লেখক ছিলেন সুকুমার রায় (১৮৮৭ ১৯২৩)। পরে 'হ-য-ব-র-ল' (১৯২৪) আর 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩) বই দুটিতে এই সব কবিতা আর গল্প স্থান পায়। এমনই করে সন্দেশ পত্রিকা সুকুমার রায়কে করে তুলেছিল কিশোর-সাহিত্যিক।

প্রবন্ধের '২' সংখ্যক মধ্যায়ে সুকুমার রায়ে 'আবোল তাবোল' এবং কুলদারঞ্জন রায়চৌধুরী (১৮৭৮- ১৯৫০) আর সুখলতা রাও-এর দুটি বইয়ের যুক্ত প্রকাশের উল্লেখ করেছেন লেখক। তিনি এই প্রসঙ্গে রায়চৌধুরী পরিবারের রচিত শিশু-কিশোরসাহিত্যের লক্ষণ বিচার করেছেন। তার মতে এই পরিবারের কিশোর-সাহিত্যিকবৃন্দের ছিল সহজ ভাষায় সাহিত্যরস সঞ্চারের ক্ষমতা আর ছোটোদের মনের মতো করে গল্প বলার অসাধারণ নিপুণতা। উপদেশ থাকত এঁদের রচনায়। কিন্তু কখনই তা চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হত না। গল্পের স্বাভাবিক গতিতে তা মূর্ত হত। তবে সুকুমার রায়ের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক গল্প-সংকলন 'পাগলা দাশু' (১৯৪০) যে সময় বদলে যাওয়ার চাপে ঈষৎ বিবর্ণ সে সত্য সম্পর্কে উদাসীন নন বুদ্ধদেব। এ থেকেই বোঝা যায় বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে ছিল কতটা অনুপুঙ্খ-সচেতনতা।

সুখলতা রাও বিদেশি রূপকথার, বিশেষত গ্রিম ভাইদের (Jakab Grimn; ১৭৮৫-১৮৬৩; Wilhelm Grimn: ১৭৮৬-১৮৫৯) রূপকথার আদলে লিখেছিলেন ছোটো আকারের কয়েকটি গল্প । নতুন পড়তে শেখা ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে ছোটো ছোটো বাক্য সাজিয়ে ঘরোয়া সুরে রচিত এমন গল্প কমই লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায়।

গ্রিম ভাইদের অনুসরণ করেছেন সুখলতা। কিন্তু তার জন্য সুখলতার গৌরব হানি হয় না। কারণ রূপকথার মধ্যে থাকে সর্বজনীনতার সুর। এক গল্পের নানা রূপ দেখা যায় দেশ ভেদে। এই রূপভেদ মানব জাতির আদি ঐক্যের প্রমাণ। দুই গ্রিম ভাই করেছিলেন প্রাচীন জার্মান রূপকথার সংকলন। সুখলতার লেখনীতে এই সব রূপকথা পেয়েছে নিতান্ত বাঙালি রূপ।

আসলে প্রথম যুগের বাংলা কিশোর-সাহিত্যে অনুবাদ বা বিদেশি রচনার স্বীকরণ-প্রবণতা ছিল প্রবল। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন

মিত্রমজুমদারের ‘চারু ও হারু’ (৫ম সংস্করণ ১৩৫ ২ব.) ভিন্ন অন্য গল্পগুলি সাধারণত বিদেশি কাহিনির অনুবাদ বা অনুসরণ। যোগীন্দ্রনাথ সরকারও অনুবাদ করেছেন বহু ভিনদেশি গল্প আর কবিতা। এদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন দেশের রত্নরাজি সংগ্রহ করে বাংলা শিশুসাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলা। কোনো দেশের সাহিত্য যখন গড়ে উঠতে থাকে তখন থাকে না অনুবাদ আর স্বাধীন রচনার ভেদ। দেশীয় উন্নত রচনার অভাব অতীতের সাহিত্য আর বিদেশি সাহিত্য থেকে গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। এর ফলে কর্ষিত হয় মনোভূমি, সৃষ্টি হয় সাহিত্যের আবহ; সম্ভব হয় সফল সাহিত্যিকের আবির্ভাব।

বাংলাদেশের সাবালক পাঠ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০ ১৮৯১) বিদেশি আখ্যানের অনুসরণে রচিত ‘কথামালা' (১৮৫৬)-র সঙ্গে দেখা দিয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) অনূদিত ‘মহাভারত’ (১৮৬০-১৮৬৬); অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) স্বাধীন সৃষ্টি কম। বিদেশি সাহিত্যের অনুসরণই তিনি করেছেন অধিক। দেশের অতীত সাহিত্য থেকে সাহিত্য-উপাদান সংগ্রহ শুধু অভিজাত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে সীমিত ছিল না। দেশীয় লোকসাহিত্য, রূপকথা (দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার : ১৮৭৭-১৯৫৭), লোককথা (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : ১৮৬৩-১৯১৫), ছড়া (যোগীন্দ্রনাথ সরকার : ১৮৬৬-১৯৩৭) স্থান পেয়েছিল লিখিত সাহিত্যে।এই ধারার প্রভাব লক্ষিত হয় ইতিহাস ও গাথা গল্পের কাব্য-রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী (১৯০৮)-র মধ্যে।

প্রবন্ধের ‘৩’ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) সাহিত্য-বিশেষত্ব।

সুকুমার রায় – বুদ্ধদেব বসুর মতে একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কৌতুস্রষ্টা, মহৎ শিশুসাহিত্যিক এবং বয়স্ক পাঠ্য সাহিত্যের সফল রচয়িতা। তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে লুইস ক্যারল-এর সৃষ্ট যুক্তিনির্ভর আশ্চর্য জগতের আর এডওয়ার্ড লিয়র-এর লেখা আপাত অর্থহীন ব্যক্তিপ্রধান লিমেরিক কবিতার।

বুদ্ধদেব বসু বলেন যে যন্ত্রপ্রধান আধুনিক যুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের বিলোপ ঘটায়। সাহিত্যে নানাভাবে করা হয় এর প্রতিবাদ। লিয়র-এর পাঁচ পঙক্তির ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে প্রতিবাদের অন্যতম রূপচিহ্ন। তাঁর কবিতার মানুষগুলি যা খুশি তাই করে। যে সব মানুষ তাদের দেখে হাসে তারা হল সমাজ। এই সমাজ মুছে দিতে চায় মানুষের নিজস্বতা। সুখকর মানিয়ে চলা, মেনে চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্যারল-এর অসম্ভব হাস্যকর কবিতার তাৎপর্য। ভিক্টরীয় যুগের স্মরণীয় দান এই অসম্ভব 'ননসেন্স' সাহিত্য।

ক্যারল-এর লেখায় অ্যালিস-এর স্বপ্নজগতেও দেখা যায় চলিত নিয়মের বিপরীত ঘটনার বিবৃতি।

সুকুমার রায়ের কবিতায়ও লক্ষিত হয় এমনই প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা। মনে পড়ে রাজার পিসির কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলা, আর ছায়া ধরার ব্যাবসা করা মানুষটির কথা।

লুইস ক্যারল (Charles Lutwidge Dodzson : ছদ্মনাম Lewis Carroll; ১৮৩২-১৮৯৮) এডওয়ার্ড লিয়র (Edward Lear : ১৮১২-১৮৮৮) – দুই ইংরেজ লেখকের কাজে সুকুমার রায় ঋণী। আবার এঁদের সঙ্গে সুকুমার রায়ের ছিল অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য। ক্যারল-এর মতো তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, বিজ্ঞানী। শব্দতত্ত্ব-সন্ধিৎসু লিয়র-এর মতো সুকুমারও ছিলেন চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক। এ দু-জন ইংরেজ লেখকের মতো একই সঙ্গে যুক্তিধর্মী ও খেয়ালি ছিল সুকুমার রায়ের মন। এই দুটি গুণের অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব প্রকৃত খেয়াল রসের, উৎকল্পনার যথার্থ শিল্পসার্থক সাহিত্য রূপায়ণ।

তবে সুকুমার রায় লিখেছেন 'সৎপাত্র' বা 'ট্যাশগরু'র মতো ব্যঙ্গ কবিতা। ব্যঙ্গ কবিতা খেয়াল রসের কবিতার সমধর্মী নয়। কারণ অদ্ভুত রসের লেখায় উদ্দেশ্য থাকে আড়ালে আর ব্যঙ্গ সাহিত্যে উদ্দেশ্য হয় স্পষ্ট। একই সঙ্গে সুকুমার লিখেছেন 'হাত গণনা', নারদ, নারদ', 'গন্ধবিচার'-এর মতো চরিত্র আর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক কবিতা। তাই সুকুমার রায়কে বলা যায় গিলবার্ট কিথ চেস্টটন (Gilbert Keith Chesterton :

১৮৭৪-১৯৩৬)-এর মতো ব্যঙ্গনিপুণ আর অদ্ভুত রস সৃষ্টির ক্ষমতাযুক্ত সাহিত্যিক। ক্যারল বা লিয়র-এর মতো কেবল খেয়াল রসের সাহিত্যিক নন সুকুমার রায়।

লিয়র ও ক্যারল কেবলমাত্র লঘু কৌতুক-কবিতার লেখক। কিন্তু সুকুমার রায় কেবল হাস্য রসের লেখক নন, কেবল শিশুসাহিত্যিকও তাকে বলা যায় না। তার কবিতায় পাওয়া যায় বিশুদ্ধ কাব্য রস। 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩)-এর বেশ কিছু কবিতা তার দৃষ্টান্ত। 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার' 'মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে রামধনুকের আবছায়া'-র মতো পঙক্তি রচনা প্রকৃত কবির পক্ষেই সম্ভব। রামগরুড়ের ছানা বা 'হুলোর গান' চিত্রময়তা আর ছন্দ-ব্যবহারের দক্ষতায় হয়ে উঠেছে কৌতুক-গাঢ় প্রকৃত কবিতা। এরকম অনেক কবিতার জন্য আবোল-তাবোল হয়ে উঠেছে সব বয়সের উপভোগ্য কবিতা-সংকলন। এ সংকলনের অনেক কবিতায় আছে ব্যঙ্গ-তির্যকতা। সেই সঙ্গে কিছু ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ চিত্রিত করে তিনি সমাজের অর্থহীন বিধির সমালোচনা করেছেন নিপুণভাবে।

ছন্দ এবং মিলের সুনিপুণ ব্যবহারের বিচারে সুকুমার রায়কে সত্যেন্দ্রনাথের উপরে স্থান দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। তার মতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার মিল ও ছন্দ ব্যবহারের লঘুতা তার কবিতাকে করেছে। কিশোরপাঠ্য আর এই কলাকৌশলের দীপ্ত ব্যবহার-গৌরবে সুকুমার রায়ের কবিতা হয়ে উঠেছে পরিণত মনের খোরাক।

'খাই খাই' (১৯৫০) সংকলনের আশ্চর্য কবিতা 'খাইখাই'। অদ্ভুত আহারের বর্ণাঢ্য সূচির সঙ্গে বাংলা ক্রিয়া পদের বিচিত্র ব্যবহারের কবিতা-ধৃত উদাহরণ এই রচনাটি। এই বিস্তৃত ও পূর্ণ তালিকাযুক্ত কবিতাটিকে বলা যায় শব্দতত্ত্ব বিষয়ে কাব্য-প্রবন্ধ। গাভীর জ্ঞানের সঙ্গে রসসৃষ্টির দক্ষতা মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এই বিভাময় মিলযুক্ত কবিতাটি। শব্দ বিষয়ে সুকুমার রায়ের আর একটি চমক লাগানো রচনা 'শব্দকল্পদ্রুম' (রচনাকাল ১৯১৫)।

গদ্যও সুকুমার রায়ের কথা নিয়ে দক্ষ ক্রীড়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে 'অবাক জলপান' নাটিকায় পুরোপুরি আর চলচ্চিত্তচঞ্চরি' (রচনাকাল ১৯১৫ : ১ম প্রকাশ বিচিত্রা' আশ্বিন ১৩৩৪ ব.)-তে আংশিকভাবে।

দুটি শব্দ যুক্ত করে নতুন শব্দ নির্মাণে সুকুমার রায় অনেকটা ক্যারল এবং তার উত্তরসূরি জেমস জয়েস (James Jayce : ১৮৮২-১৯৪১)-এর অনুবর্তী। ততটা সূক্ষ্মতা না থাকলেও 'বকচ্ছপ', 'হাঁসজারু' ধরনের শব্দ গঠনে তার কৃতিত্ব খর্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পসল্প' (১৯৪১)-তে এমন কিছু শব্দ বানিয়েছেন। যেমন 'হিদিককার' বা 'বুদবুধি'। প্রথম শব্দটিতে আছে হৃদয়, হিক্কা আর ধিক্কার—এই তিন শব্দের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় শব্দটি গঠিত হয়েছে বুধ আর বুদ্বুদ মিলে। এভাবে অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশকে সূক্ষ্ম বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে তার সৃষ্ট শব্দগুলি বেশ গুরুভার। ক্যারল-এর নির্মিত স্লাইদি (Slithy) বা 'মিমসি' (Mimsy)-প্রভৃতি শব্দকে মনে করায় এসব শব্দ। ক্যারল প্রথম শব্দটি তৈরি করেন। দুটি শব্দ "লিথ' (Lithe) আর স্লাইমি' (Slimy) মিশিয়ে দ্বিতীয়টি তৈরি হয়েছে 'ফ্লিমসি' (Flimsy) আর "মিজারেবল' (Miserable) শব্দ দুটির মিলনে। এই 'তোরঙ্গ শব্দ' (Port manteau word)-এর চূড়ান্ত ব্যবহার আছে জেমস জয়েস-এর রচনায়।

সুকুমার রায় যুগ্ম শব্দ নির্মাণে এই গুঢ় ব্যঞ্জনা আনতে পারেননি। কিন্তু শ্লেষ, পান (Pun), যমক – একই শব্দের দ্ব্যর্থক ব্যবহারে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে তার 'অবাক জলপান' (১ম প্রকাশ সন্দেশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ব.) নাটিকাটি 'জল' শব্দটির আশ্চর্য ব্যবহার রচনাটিকে করেছে স্বতন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু 'সন্দেশ'-এর পরের যুগের শিশুসাহিত্যের অর্থাৎ বিশ শতকের মধ্য ভাগের বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। এ পর্বের শিশুসাহিত্য মুলত সুধীন সরকার (১৮৯২ ১৯৬৮) সম্পাদিত 'মৌচাক' (১৯২০) পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধের শিশুসাহিত্যের লেখকবৃন্দ অন্য কিছু লিখতেন না। আর সে সময়ের সাধারণ লেখকগন শিশুসাহিত্য রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। 'মৌচাক' শিশুসাহিত্যের এই ভেদরেখা মুছে দিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ছিলেন 'মৌচাক'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১) এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল।

‘ভারতী’ আর 'কল্লোল' – দুটি গোষ্ঠীর সাহিত্যিকগণই প্রধানত 'মৌচাক’-সম্পাদক সুবীরচন্দ্র সরকারের প্রেরণায় এ সময়ে কিশোরদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুর মতে প্রধানত এই কারণে আর যন্ত্রসভ্যতা জাত বিনোদন-মাধ্যমের কারণে (রেডিও ও সিনেমা) বাংলা শিশু সাহিত্যে এসেছে পরিবর্তন। রচনার বিষয় ও সুর পালটে গেছে।

শিশুসাহিত্যকে বুদ্ধদেব বসু দুভাগে ভাগ করেছেন - ১) সদ্য পড়া শেখা নাবালকদের জন্য রচিত সাহিত্য। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা এই শ্রেণিতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য কিছুটা পরিণতমনস্ক কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা। এই সাহিত্য বয়স্কগণও উপভোগ করতে পারেন। অনেক সময় লেখক সচেতনভাবেই এইরূপ লেখেন যাতে তাঁর রচনা হয়ে ওঠে সর্বজনভোগ্য।

এর ফলে কিশোরসাহিত্যে এসেছে উপাদান, বৈচিত্র্য আর রচনা-সমৃদ্ধি। বেড়েছে প্রকাশনার পরিমাণ লেখা হচ্ছে বহির্জীবননির্ভর ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনি আর কৌতুক-কাহিনি। এই দুই ধরনের লেখায় মাঝে মাঝে কিশোর ও বয়স্ক-সাহিত্যের ভেদ হয়ে যায় অস্পষ্ট। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬০) 'যকের ধন’ পুরোপুরি কিশোরসাহিত্য। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) বিজ্ঞাননির্ভর অভিযান কাহিনিগুলিতে পরিণত মনের উপভোগ্য সাহিত্যের সম্ভাবনা থাকে। অথচ সেই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ সেসব কাহিনি বয়স্কদের গণ্ডি থেকে ছিটকে গেছে, কিশোরসাহিত্যে।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)-র মধ্যেও ছিল পরিণত মনের উপযোগী কৌতুক সৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু স্বভাবের ছেলেমানুষি তাকে কেবল কিশোর কৌতুক সাহিত্যের স্রষ্টা করে রেখেছে। বড়োদের জন্য তিনি যা লিখেছেন সেগুলি আসলে কিশোর কাহিনি; তার সঙ্গে আছে আদিরসের মিশ্রণ। এটুকুই তফাত।

পুনরাবৃত্তি, শ্লেষ-যমকের অকারণ-বাহুল্য শিবরামের লেখার ত্রুটি। কিন্তু যথার্থ কৌতুককাহিনি তিনি নিপুণভাবেই সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি, কিশোরদের সঙ্গে বয়স্করাও সমভাবে উপভোগ করেন। যেমন 'কালান্তক লাল ফিতা'। এ গল্পে-সরকারি নিয়মের বন্ধন থেকে প্রাপ্য উদ্ধারের চেষ্টা ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে পুরুষানুক্রমে। 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'-এ অভ্যাসবহির্ভূত সুখাদ্য পেয়ে ঘোড়া হাসতে হাসতে মারা যায় বা কুশল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় সংখ্যানির্ভর ভাষায় – এই সব গল্পে ব্যঙ্গ ততটা নেই; আছে নির্মল কৌতুক যা বয়স্কগণও কিশোরদের সঙ্গে সমভাবে উপভোগ করতে পারেন। এমন গল্প সমকালে আরও অনেকে লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রলাল রায়ের (১৯০৪-১৯৬৯) লেখা দুটি গল্পের। বস্তুত ব্যঙ্গ তিক্ততাহীন আঘাতশূন্য নির্মল কৌতুক-নির্ভর গল্প বাংলা কিশোরসাহিত্যেই লেখা হয়েছে, বেশি।

কিশোর সাহিত্য হিসেবে ব্যঙ্গ-তির্যক কৌতুক রচনাও লেখা হচ্ছে প্রচুর। এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন অন্নদাশঙ্কর বায়ের (১৯০৪-২০০২) ছড়া। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন তার 'উড়কি পানের মুড়কি' (১৯৪২) আর 'রাঙা ধানের খৈ' (১৯৫০)-ছড়া-সংকলন দুটির। ছড়ার ছন্দ-চটুল ক্ষুদ্র অবয়বে তিনি দক্ষভাবে সঞ্চার করেছেন বিষয়গৌরব। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ তার ছড়ায় সুসমঞ্জসভাবে স্থান পায়। রাজনীতি 'সন্দেশ' যুগের শিশুসাহিত্যে স্থান পেত না। এদিক দিয়ে দুই যুগের তফাত বোঝা যায় সহজেই।

সন্দেশ-পূর্ব আর পরবর্তী যুগের শিশুসাহিত্যের মধ্যের প্রভেদ স্পষ্ট হয়েছে লীলা মজুমদারের (১৯০৮) লেখায়। তার লেখায় বিষয়গত নতুনত্ব নেই; আছে গঠনগত অভিনবত্ব। তিনি লিখেছেন কিশোরের জবানিতে কিশোরমনের সুখ-দুঃখ কল্পনার কথা। তার 'দিনদুপুরে' (১৯৪৮; 'বদিনাথের বড়ি' : ১৯৪০ সংকলনটি পরে এ নামে মুদ্রিত হয়।) এর সঙ্গে 'পাগলা দাশু' (১৯৪০)-এর অল্প সাদৃশ্য আছে। বালিকা নয় তিনি লিখেছেন বালকমনের কথা। তাদের চলিত শব্দ-নির্ভর বাচনরীতি তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন। এদিক দিয়ে তার গল্পে আরও বেশি পরিণতি দেখা যায়। তার সঙ্গে মিল নেই সমকালের আন্য কোনো লেখকের। সংযত কৌতুক আর কল্পনার সফল অন্বয়; অদ্ভুত কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সমান মিশ্রণ, ধীর লয়ের ছন্দমধুর

গদ্য ভাষা – এসব কারণে লীলা মজুমদার বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করতে পারেন অনায়াসে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রচিত শিশুসাহিত্যের আলোচনা।

বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ ছিল সরল, সংকলন ও অনুবাদভিত্তিক সর্বতোভাবে শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের যুগ। এর পরের যুগে শিশুসাহিত্যে দেখা দিল উপকরণ-বৈচিত্র্য; নতুন ভাবনা ও রূপ-রুদ্ধ একই সঙ্গে কিশোর ও বয়স্কভোগ্য রচনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার সময় এই দুই যুগে বিস্তৃত। দু-যুগের চিহ্ন আছে তার লেখায়। তবে নিছক শিশুসাহিত্যের গণ্ডিতে সীমিত করা যায় না তার রচনা। তার ‘নালক’ (১৯১৬) ‘রাজকাহিনী' (১৯০৯ : অনুসৃত গ্রন্থঃ কর্নেল টড (James Tod : ১৭৪২-১৮৩৫)-এর ‘অ্যানাল অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান অর দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন রাজপুর স্টেটস অফ ইন্ডিয়া' ('Anal and Antiquities of Rajsthan or the Central and Western Rajput States of India', 3 Vols. ১৮২৯), 'বুড়ো আংলা (১৯৪১ : সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগেরলফ Selma Lagerlof । ১৮৪৮ ১৯৪৯-এর “দি ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চারস অফ নিলস’ : "The Wonderful Adventures of Nils' : ১৯০৭-এর অনুসরণে রচিত), “আলোর ফুলকি' (১৯৪৭ : ফরাসি লেখক এডমন্ড ইউজিন রোস্তা : Edmond Eugene Rostand : ১৮৬৮-১৯১৮ : রচিত চার অঙ্কের রূপক কাব্যনাট্য ‘চ্যান্টিক্লিয়ার 'Chanteeler' ১৯১০: এটি কাহিনি রূপে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ফ্লোরেন্স ইয়েটস বান ‘দ্য স্টোরি অফ চ্যান্টিক্লিয়ার ‘The Story of Chantecler' নামে। “আলোর ফুলকি তার ভাব অবলম্বনে রচিত) বিশেষ করে ছোটোদের বা বড়োদের জন্য লেখা হয়নি। তিনি স্ব-সত্তায় স্থিত অ-তুল্য সাহিত্যিক। অনুভূতিপ্রবণতা অথচ আসক্তিহীনতার আশ্চর্য মিলন দেখা যায় তার লেখায়। তার লেখা স্ববৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। সমকালের কোনো লেখকের প্রভাব নেই তাঁর রচনায়। তিনি পাঠকের কথা ভেবেও লেখেননি। তাঁর রচিত শিশুসাহিত্য জীবনের সাহিত্য, চিরকালীন মানুষের সাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন

“পথে-বিপথে' (১৯১৯) যে গ্রন্থে তার নিজস্বতা ততটা স্পষ্ট নয়। তার কথিত বই ‘ঘরোয়া' (১৯৩১), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) তথ্য-উৎস হিসেবে মূল্যবান। ‘ভূতপতরীর দেশ’ (১৯১৫)-কে বুদ্ধদেব বসু গঠনগত দিক থেকে দুর্বল বলে মনে করেছেন। সে কথা তিনি বলেছেন পাদটীকায়।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্রষ্টা মনটি আত্মপ্রকাশ করেছে ‘নালক’, ‘রাজকাহিনী', ‘বুড়ো আংলা’, ‘আলোর ফুলকি'-র মতো বইগুলিতে। সেসব গ্রন্থে তিনি চিরকালের গল্পপ্রিয় মানুষকে শুনিয়েছেন তার প্রাণের ভাষায় লেখা গল যে ভাষা চিত্রল এবং বনিময়। তা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, স্পন্দন তোলে তার অনুভব গুলোকে। বুদ্ধদেব বসুর মতে অবনীন্দ্রনাথ হাল আন্ডেরসন (Hans Christian Anderson) : ১৮:০৫-১৮৭৫)-এর মতো বিশ্বজনীন সাহিত্যের লেখক। তারই মতো অবনীন্দ্রনাথও শিশু আর পশুদের ভালোবাসেন গভীরভাবে। সেই ভালোবাসা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তার লেখার ছত্রে ছত্রে। সে ভালোবাসা পাঠক-হৃদয়কেও পন্দিত করে তোলে। ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৮)-এ ষষ্ঠীতলায় বিশ্ব-শিশুদের বর্ণনার সঙ্গে বাংলার রূপকে 'ছড়ার মন্ত্রে জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি সহজ স্বচ্ছলতায়।

শিশুপ্রীতির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে আছে বহু প্রাণবান শিশুচরিত্র। চার খণ্ড ‘গল্পগুচ্ছ' (১-৩ খন্ড ১৯২৬, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬২)-এর ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘দুটি', 'রাসমণির ছেলে’, ‘খাতা’ – এইসব গল্প, ‘দেবতার গ্রাস'-এর রাখাল ‘পলাতকা'(১৯১৮) -র “চিরদিনের দাগা’ ‘পুনশ্চ'(১৯৩২)-র ‘শেষ চিঠি’ প্রভৃতি কবিতা; ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) থেকে ‘বিসর্জন' (১৮৯০), শারদোৎসব’ (১৯০৮), ‘ডাকঘর’ (১৯১২) এ সমস্ত নাটক — সর্বত্রই প্রাণবন্ত শিশুচরিত্র নির্মাণ রবীন্দ্রনাথের গভীর বাৎসল্যের প্রমাণ দেয়। শিশু (১৯০৯)-র কবিতা সমূহ এই স্নেহপ্রবণ মনের স্পর্শে হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে দিনানুদিনের বাস্তব চিত্র আর চিরন্তনত্বের অনুভবগাঢ়তায় অপরূপ।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন বাংলা ছোটো গল্প ও উপন্যাসে শিশু-চরিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থাপন দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি' (১৯১৪), ‘বিন্দুর

ছেলে' (১৯১৪), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব ১৯১৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) 'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭) প্রমাণ করে বাংলা কথাসাহিত্যে শিশু এবং শৈশবের উপস্থাপনা কতটা বিস্তৃত এবং শিল্পসার্থক। তার মতে হয়তো স্বভাবত শিশুপ্রেমিক বলেই বাঙালি লেখকের রচনায় দ্বন্দ্ব-জটিল সাবালক জীবন অপেক্ষা সরল শৈশবের ভাষাচিত্র অঙ্কণে অধিক নিপুণতা লক্ষিত হয়।

শিশুপ্রীতির সাদৃশ্য ভিন্ন অবনীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিশুচরিত্রের মধ্যে মিল তেমন নেই। এই উভয় লেখকের লেখা শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো প্রভেদ এই যে অবনীন্দ্রনাথের বই সর্বজন-উপভোগ্য হয়েও বিশেষভাবে শিশুদের জন্যই লেখা। আর রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন সঠিক অর্থে ছোটোদের বই একটিও লেখেননি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভা কেবল শিশুসাহিত্যের মধ্যে সীমিত থাকতে পারেনি। তার শিশু (১৯০৯), "শিশু ভোলানাথ'- (১৯২২)-এর কয়েকটি কবিতা এবং 'মুকুট' (১৯০৮) নাটক, ভিন্ন ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), "অচলায়তন' (১৯১২), 'কথা ও কাহিনী' (১৯০৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'লিপিকা' (১৯২২) – কোনোটিই বিশেষ করে ছোটোদের জন্য লেখা হয়নি। তিনি কিশোরসাহিত্য রচনা করেছেন আত্মবিনোদন হিসেবে। তথাপি তার কিশোরসাহিত্য যেমন 'সে' (১৯৩৭), "খাপছাড়া" (১৯৩৭), 'গল্পসল্প' (১৯৪১) – এগুলি সাহিত্য হিসেবে সার্থক। কিন্তু শিশু সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ প্রকাশদীপ্তি এসব গ্রন্থে অনুপস্থিত। 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫)-এর সঙ্গে 'সে' আর 'আবোলতাবোল (১৯২৩)-এর 'খাপছাড়া'-র তুলনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

আসলে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ একটি দিক শিশুসাহিত্য আর অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লিখেছেন ছোটোদের জন্য। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-তে তাই পরিণত জীবনের ছবি এত জীবন্ত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ জীবনকে করে তুলেছেন নির্ভার। 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭)-তে রয়েছে জীবনের সেই ভারহীন অথচ গভীর রূপের ভাষাচিত্র। পরিণত জীবনধারার প্রেম, হিংসা, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব সবই আছে তার রচনায়। নারী-পুরুষ মিলনের কথা

অবনীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। "আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা" দুটি গ্রন্থেই জীবনের মূল কিন্তু শিশুসাহিত্যে নিষিদ্ধ এই দিকটি বাস্তব হয়ে উঠেছে। অথচ বস্তুজগতের 'ভার বা ঘনত্ব সেখানে নেই। অবনীন্দ্রনাথের সব গল্পই রূপকথা আঙ্গিকের। শিশুদের মতো করে তাদের মাপে কাহিনি নির্মাণে দক্ষ অবনীন্দ্রনাথ। শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন বলেই তার সৃষ্টিতে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিস্ময় ওতপ্রোত হয়ে আছে। নিরাসক্ত প্রীতির দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন। প্রাণের শুদ্ধতায় তার শ্রদ্ধা। তাই হন্তা আর হত – দুই জীবনই তার চোখে হয়ে ওঠে অস্তিত্বের জন্যই সুন্দর। তার পশু-পাখি, প্রকৃতি, আবহ সব কিছুতেই অস্তিত্বের প্রগাঢ় আনন্দের উদ্ভাস লক্ষিত হয়। সকলের প্রতিই তার শ্রদ্ধা। তাই তার গল্পে শোনা যায় প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়া, অস্তিত্ব মাত্রের প্রতি চিরকালীন প্রীতি আর বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার বার্তা। এখানে তিনি ডেনমার্ক-এর সাহিত্যিক হান্স আন্ডেরসন-এর সঙ্গে তুলনীয়। তবে খ্রিস্টান ঐতিহ্যের পাপবোধ আন্ডেরসন-এর গল্পে প্রবল। দোষীরা তার গল্পে কঠিন শাস্তি পায়। আর হিন্দু-মনে নরক-ধারণা ততটা দৃঢ় নয় বলে অবনীন্দ্রনাথের গল্পে অপরাধীর শাস্তি অত কঠোর নয়।

প্রবন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু বালক-বালিকাদের পড়া শেখানোর দুটি বই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৬-১৯৩৭) 'হাসিখুসি' (১ম ১৮৯৭ : ২য় ১৯০৪) আর রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' (১ম ও ২য় খণ্ড ঃ ১৯৩০) নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধ্যায়ের সূচনায় তার মত সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য যে প্রকৃত শিশুসাহিত্যের মধ্যে থাকে সর্বজনীনতা। কালের বিচারে যা অমর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে – সেই "মহাভারত', 'রামায়ণ', 'বাইবেল', 'আরব্যোপন্যাস', 'বিশ পুরাণের গল্পাবলী', পৃথিবীর সব দেশের রূপকথা - আর 'ডন কুইক্সোট', ('Don Quixote' : ১ম ১৬০৫, ২য় ১৬১৫ লেখক স্পেন দেশের সাহিত্যিক Cenvantes Saavedra Miguel de : ১৫৪৭-১৬১৬) রবিনসন ক্রুসো' (Daniel Defoe : (১৬৬১-১৭৩১) রচিত। "Robinson Crusoe' : ১৭১৯) 'গালিভার' (Jonathan Swift; (১৬৬৭-১৭৪৫) : এর লেখা 'Gulliveis Travels' : ১৭২৬) – তাই শিশুদেরও প্রিয়। এরই বিপরীতে

বলা যায় উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যের মৌলিক গুণ জন-উপভোগ্যতা। তাই শিশুসাহিত্য, বয়স্কসাহিত্য – এই প্রভেদ মূল্যহীন। কিন্তু পড়তে শেখানাের জন্য " শব বই লেখা হয় তাদের মধ্যে এই সর্বজনীনতা সাধারণত দেখা যায় না। এরকম একটি বই 'হাসিখুশি' (মূল বানান 'হাসিখুসি') - যার তুলনীয় ইংরেজি বই নেই বললেই হয়। এ ধরনের ইংরেজি বইতে বৈচিত্র্য, আর রচনাকৌশল আছে। লেখক, চিত্রী আর মুদ্রাকরের সমবেত পরিকল্পনার সৃষ্টি সেসব বই। কিন্তু হাসিখুশি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হৃদয়ের সৃষ্টি। শিশুমনস্তত্ত্ব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তিনি বুঝতে শিশুর মন। সে মনের উপযোগী বই রচনায় তিনি রচনাশক্তি, সংগতিয়ান আর প্রকৃত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনায় শিশুমনের সজীবতা বাস্তব হয়ে উঠেছে। সে মনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে সক্ষম তার রচনা।

আন্তরিকতা আছে বলে এ গ্রন্থে ভাষায় আঁকা ছবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সজীবতা। ইঙ্গিতমুখ্য ভাষাচিত্রের সঙ্গে এ বইতে আছে রঙিন কালিতে ছাপা তারই আঁকা ছবি। ভাষার ছবি আর আঁকা ছবি দুয়ে মিলে শিশুর মনের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে দিতে পেরেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তার অক্ষরজ্ঞাপক উদাহরণ মালায় আছে পশুপাখির আধিক্য আর মাঝে মাঝে আছে আশ্চর্য পারম্পর্য – ওলের পরে ঔষধ, চিন্তার লাল ঠোঁটের পর ঠাকুরদার শীর্ণ গণ্ড তার উদাহরণ। 'হাসিখুশি'-র প্রধান বিশেষত্ব তার নির্মল আনন্দ দানশক্তি। তার সঙ্গে প্রাণশক্তির সম্মিলন গ্রন্থটিকে করে তুলেছে চিরকালীন।

'হাসিখুশি'র তুল্য একটিমাত্র বাংলা বই রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' (১৯৩০)। 'সে' (১৯৩৭), 'খাপছাড়া' (১৯৩৯)-র প্রায় সম-সময়ে লেখা বইটি স্ব-বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। পাঠ্যপুস্তক রচনার কারণে আপন প্রতিভার সীমিত ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ এ বই লেখার সময়। ফলে বইটি একই সঙ্গে হয়েছে সাহিত্য এবং অক্ষর চেনার সহজ বই। ছন্দ-বিচিত্রতা, অপূর্ব মিল ব্যবহার, আশ্চর্য মৃদু অনুপ্রাস - সব কিছুর সংযত প্রয়োগ বইটিকে করে তুলেছে অনন্য।

এ বইয়ের গদ্য অংশের ভাষাও ছন্দ-স্পন্দিত এবং চিত্রময়। ‘সহজপাঠ’ অক্ষর চেনার সঙ্গে শিশুদের দেয় সাহিত্যের স্বাদ - এ কারণেই বইটি স্ব-মহিমায় দীপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রবন্ধ লেখার সময়ের শিশুসাহিত্যের প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তার চোখে পড়েছে শ্রীহীন হত্যাকাহিনির প্রাচুর্য - আর শিশুপত্রিকা-দৈনিক পত্রের শিশু-বিভাগে উপদেশ-প্রধান রচনার বাহুল্য। তবে তার মতে কেবল শিশুসাহিত্য নয়, বয়স্কসাহিত্য, উৎসব, গান, চলচ্চিত্র – শিল্পের সকল শাখায় দেখা যাচ্ছে রুচিহীনতার আধিক্য। কিন্তু এটাও ঠিক যে পার্থিব ভোগাকাঙ্খার সঙ্গে মানুষের মনে থাকে অমৃতের কামনা। সে কামনা পূর্ণ করার জন্য জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে আসেন শিল্পী সাহিত্যিক। এ ধারা কখনও থেমে যায় না। বাংলা শিশুসাহিত্য এতই সম্পন্ন যে সাময়িক বিকৃতি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। পরিণত মনের খোরাকের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে শিশুমনের উপযোগী পুষ্টি ও তৃপ্তির উপাদান প্রচুর। গৃহপ্রিয় বাঙালীর মনের প্রকাশ আর তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দানে সমৃদ্ধ বাংলা শিশুসাহিত্য। তার ঐতিহ্য তাকে রাখবে সুস্থ। বিকৃতি কোনোদিনই প্রাধান্য পাবে না এ সাহিত্যে।

১০.৪ সাহিত্যচর্চা

‘সাহিত্যচচা’ সংকলনের ‘২’ চিহ্নিত গুচ্ছের দ্বিতীয় প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক। চার অধ্যায়ের এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৫২। স্বভাবকবির সংজ্ঞা বিচার দিয়ে শুরু হয়েছে প্রবন্ধ। ‘স্বভাবকবি’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল পুরাণের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে (১১৮৫৫-১৯১৮) | সাধারণ অর্থে সব কবিই স্বভাবকবি কারন সর্বপ্রকারের শিল্প সাধনার ক্ষমতা ব্যক্তির স্বভাবজাত শক্তি। তবে সাধারণত ‘স্বভাবকবি’ বলতে বোঝায় সেই কবিকে যিনি অনুভব – ভিত্তিক কবিতা রচনায় বিশ্বাসী। যে কবির রচনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ নেই, আবেগই যার একমাত্র নির্ভর তিনিই স্বভাবকবি।

কবিতায় আবেগ থাকা আবশ্যক। আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে সংযত করে সংহতভাবে তাকে ভাষাবদ্ধ করে বুচিত হয় কবিতা। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যার নেই – তিনিই স্বভাবকবি।

এই আবেগের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ কবিদের মধ্যে দেখা যায় কখনও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব হিসেবে; কখনও বা ঐতিহাসিক কারণেও এ শ্রেণির কবির দেখা মেলে। গোবিন্দচন্দ্র দাস ব্যক্তিগত বিশেষত্বের দিক দিয়ে স্বভাবকবি। কারণ অনুভবের প্রাবল্য সংযত করার প্রবণতা তার ছিল না। এ কারণে রবীন্দ্রসমকালীন হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন।

বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণে দেখা দিয়েছিলেন একদল ‘স্বভাবকবি’। বাংলা দেশের, বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিমান কবিপ্রতিভার আবির্ভাব দু ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল — মুগ্ধতা এবং শত্রুতা।

তখন বাংলা সাহিত্য বলতে বোঝাত দাশরথি রায়ের শব্দচপল রচনাসমূহ, রামপ্রসাদ সেনের (১৮৪৫ ১৮৮৭) ভক্তিপ্রধান গীতাবলি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) পরিপাটি সাংবাদিকতা-ধর্মী রচনা আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) উচ্চকিত কাব্যসমূহ। এই দীন সাহিত্য-প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ফলে তার পরের প্রজন্মের বাঙালি তরুণ সাহিত্যিকদের বেশির ভাগ তার অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১) প্রমুখ কবিগণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মার্থ না বুঝে তার আপাত-সরল ছন্দমধুর কাব্য প্রকরণের অনুকরণ করলেন। ফলে তাদের কবিতায় দেখা গেল আবেগের শাসনহীন উচ্ছাস – যা স্বভাবকবির বৈশিষ্ট্য। গঠন-শিথিলতাকে তারা ভেবেছিলেন আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার আর চেতনার অলসতাকে মনে করেছিলেন তন্ময়তা।

এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২৩)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কেবল ছন্দবিচিত্র রচনার মধ্যে নিমগ্ন রাখলেন নিজেকে। এদের রচনাশক্তির প্রমাণ

পাওয়া যায় দু-একটি কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য টানে তাদের নিজস্বতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এদের এই আত্মালুপ্তি পরবর্তী কবিদের পক্ষে সাবধান বার্তা বলে মনে করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য - রবীন্দ্র-অনুসরণ সে সময়ে ছিল অনিবার্য। ছন্দ- প্রয়োগ, মিলবিন্যাস, ভাষা-ব্যবহার, অলংকার-যোজনা স্তবক–বিন্যাস – কবিতার সর্ব স্তরের যে বিচিত্র এ ব্যাপ্ত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার ফলে কঠিন হয়েছিল পরের প্রজন্মের কবিদের কবিতা লেখা। তাঁর সমকালের কবিরা কিন্তু ভেবেছিলেন এর ফলে কবিতা রচনা হয়েছে সহজ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই বিস্তৃত নাটকীয় পটভূমি | দান্তে, (Dante Alighicri ঃ ১২১৬৫-১৩২১) - গ্যেটে (Goethevoln Johann Wolfgang : ১৭৪৯-১৮৩২)-এর মত বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে তিনি রচনা করেননি মহাকাব্য। শেকসপিয়র (Shakespeare William : ১৫৬৪-১৫১৬)-এর মতো চরিত্র প্রাধান্য নেই তার রচনায়। মিলটন (John Milton ১৬০৮-১৬৭৪)-এর মতো বাক্যবন্ধ-সমৃদ্ধ নয় তার রচনা। পাঠকদের সঙ্গে তার মিলনের কোনো বাধা থাকে না। শব্দ বা বিষয় কোনো দিক দিয়েই তিনি স্বতন্ত্র নন; দুরূহ নয় তার রচনা। সহজবোধ্য সাবলীলতা তার রচনার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষত্ব স্বতোৎসারিতা। দৃষ্ট প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য আর প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ তাঁর কবিতায়, বিশেষত তার গানে রূপ লাভ করেছে। তাঁর কবিতা পাঠকমনকে আপ্লুত করে কিন্তু এ কারণেই তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করা কঠিন।

এ ধরনের কবিতা কবিদের পক্ষে বিপজ্জনক। মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখ আর অনুভূতিসমূহের প্রকাশ যখন অতি সহজে কবিতায় রূপ লাভ তরে তখন সে ধরনের কবিতার অনুকরণের আকাঙক্ষা দমন করা কঠিন। তার পরিণাম কী হয় তারই প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২৩), কবিতা। বুদ্ধদেব বসু তাকে রবীন্দ্রনুসারী কবিদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ সমকালের তরুণ কবিদের মধ্যে রচনা - ক্ষমতার বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তার কবিতার প্রভেদ সহজেই

চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনার প্রভেদ প্রকৃতিগত নয়। এক কাব্য-আন্দোলনের অন্তর্গত বয়সে বড়ো ও বয়সে ছোটো কবির নিজ সত্তার বিশেষ জনিত প্রভেদও একে বলা যায় না। কবিত্বের বিচারে বড়ো বা ছোটো কবি সংজ্ঞাকে অর্থহীন বলে মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। তাই সে বিচারও এখানে অবান্তর। কবিত্ব বিচারের আসল মানদণ্ড বিশুদ্ধতা। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এই শুদ্ধতা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্য-সাম্রাজ্যের পাশে ছোটো একটি রাজ্য গড়ে তোলা লজ্জার নয়; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তা করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই ঋতুবৈচিত্র্য গ্রামের ছবি, স্বদেশপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথের এই সব বিষয়ে লেখা কবিতায় আছে আবেগঘনত্ব, বিশ্বাসের সজীবতা, প্রাণশক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ। এসবই পাঠকমনে অনুরূপ অনুভূতির সঞ্চারে সক্ষম। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় নেই এই অনুভব-গাঢ়তা। তার কবিতার আবেগ তরল, বিষয় গুরুত্বহীন । রবীন্দ্র-ছন্দের সংযত মাধুর্য তার রচনায় হয়ে গেছে শুধু মাত্র শব্দ আর তালের চটুল খেলা। রবীন্দ্র-কবিতার গাঢ়ত্ব সাধারণভোগ্য তারল্যে পরিণত হয়েছিল তার কবিতায়। এখানেই তাঁর ত্রুটি। তার কবিতার ছন্দক্রীড়া শব্দকৌতুক মাত্র। তার “পিয়ানোর গান’ -এর “তুলতুল টুকটুক / টুকটুক তুলতুল” এবং রবীন্দ্রনাথের "ওগো বধূ সুন্দরী তুমি মধুমঞ্জরী।” কবিতা দুটির ছন্দ এক; বিষয়ও তেমন গভীর নয়। কিন্তু প্রথম কবিতায় নেই প্রাণের স্পর্শ। আর প্রাণের উত্তাপে দ্বিতীয় কবিতাটি হয়ে উঠেছে প্রকৃত কবিতা। যথার্থ কবি ছন্দ আর কলাকৌশলের দিক থেকেও হন অনবদ্য। কবিত্বের ন্যূনতা হেতুই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা কেবল ছন্দকৌশল হয়ে রইল। আর তার পরে একই বিষয় আর নিমিতির পুনরাবৃত্তি বাংলা কবিতাকে করে তুলল অন্তঃসারহীন আপাতরম্য শব্দসজ্জা-নির্ভর পদ্য মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের স্বাধীন সত্তার বিকাশ কতটা কঠিন ছিল তারই বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে তার প্রভাবমুক্ত পৃথক গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ ১৯৫১)-র লিখিত গদ্যসাহিত্য।

কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এমন সর্বাতিশায়ী হয়ে উঠেছিলেন যে তার রচনাপাঠ-জনিত মোহ অপসৃত হল দীর্ঘ তিন দশক পরে। এই মধ্যবর্তী সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ এবং সমকালের অন্যান্য কবি রবীন্দ্রনাথের সেই মোহনমায়া অতিক্রমের পটভূমি নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তার সহজপাঠ্য সংস্করণ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাই দীর্ঘকাল বাঙালিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। সত্যেন্দ্রনাথের সমকালে রবীন্দ্র-ছিদ্রান্বেষী বেশ কয়েকজন সমালোচক সাহিত্য-জগতে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এটাই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ ১৯২১), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) প্রমুখ-রবীন্দ্র সমালোচকদের ত্রুটি।

কাজী নজরুল ইসলামকেও বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ‘স্বভাবকবি’। নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র ছন্দে লিখেছেন প্রেমের কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় সংযম নেই; নেই আবেগের সংহত ভাষারূপ নির্মাণ-শক্তির পরিচয়। অনুভবের উচ্ছসিত প্রকাশ আর ক্রম-পরিণতির অভাব তাঁর কবিতার ত্রুটি। কবিতার নির্মাণ শিল্পের বিচারে, বৈচিত্র্যের নিরিখে সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলের সমকক্ষ বা ঈষৎ উচ্চ পর্যায়ের কবি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে সত্যেন্দ্রনাথ একান্ত রবীন্দ্র-অনুসারী কবি। নজরুল তা নন।

বুদ্ধদেব বসুর মতে কবি হিসেবে তত মহান বলা যায় না নজরুলকে। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ তিনিও অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর রচনায় প্রকট। তথাপি তার ছিল নিজস্বতা। কয়েকটি পরিপার্শ্বজনিত কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আলাদা। প্রথমত মুসলমান নজরুল জন্মেছিলেন ভিন্ন এক ঐতিহ্যের মধ্যে। হিন্দু মানসিকতা তিনি স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। বাল্য-কৈশোর মফসসলে কেটেছিল নজরুলের। মধ্যবিত্তের ধরাবাঁধা, ছকে চলেনি তার জীবন। যাত্রাগান ও লেটোগান রচনা, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রুটির দোকানে কাজ করা, সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ — এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। দেখা গেল

পরিবেশের শাসনহীন বন্যতায় পুষ্ট বলিষ্ঠ সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের কারণে তার কবিতা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতার আবেগ-প্রাবল্য ছিল। ছিল না অনুভবের সুপরিণত প্রকাশ। তার প্রভাব তেমন স্থায়ী হয়নি বাংলা কবিতায়। তাঁর গুরুত্ব এখানেই যে তিনি দেখালেন রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্য ধরনের কবিতাও বাংলায় লেখা সম্ভব। বাংলার কাব্য জগতে স্বাতন্ত্র্যের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুললেন নজরুল। তারই পরিণামে মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) তার 'স্বপনপসারী' (১৯২২) সংকলনের সত্যেন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে কবিতায় আনলেন দৃঢ় শক্তির প্রকাশ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮০-১৯৫২) ভাবগভীরতার অভাব সত্ত্বেও লিখতে লাগলেন অন্য ধরনের কবিতা। এঁদের প্রয়াসে কাব্য-জগতে এল পরিবর্তনের সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠল 'কল্লোল' সাহিত্য-গোষ্ঠীর প্রয়াসে। নতুন দিকে মোড় নিল বাংলা সাহিত্য।

প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম-প্রচেষ্টার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনার প্রথমে বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতা আনয়ন আন্দোলনে নজরুলের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। নজরুল বাংলা কবিতায় নতুন যুগ-সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিলেন অসচেতনভাবে। তার কবিতায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা আর রাজনীতি সংক্রান্ত বিদ্রোহ আছে, নেই সাহিত্যের প্রচলিত ছক ভেঙে ফেলার প্রয়াস। তবে পারসিক গজলের আঙ্গিকে গান রচনা করে, গানে নতুন ধরনের সুর দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নতুন একটি সাহিত্যধারা। তার এই সব কাজ সমকালের সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে অতৃপ্তির ভাব জাগিয়ে দিল। তাদের মনে হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নেই বাস্তবের প্রকাশ, স্বাভাবিক কামনাতীব্রতা বা জীবনের যন্ত্রণার রূপায়ণ। মানুষের শরীর-বাসনা উপেক্ষিত হয়েছে তার কবিতায়। এ ভাবনার ফলে দেখা দিল রবীন্দ্র বিদ্রোহী জীবন ঘনিষ্ঠ কামনা-রক্তিম সাহিত্য রচনার ধারা। অতিরেক আর পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছিল এ সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এর ফলে রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত কবিদের নির্মিত বাস্তব-উপেক্ষিত সুখমগ্ন জীবনভাবনার অবসান হল। প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা উপলব্ধি করল বাংলা

সাহিত্য। রবীন্দ্র-অনুসরণের দুরতিক্রম্য গণ্ডি ভেঙে ফেলতে সমর্থ হলেন কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও নিজস্ব অনুভবকে নিজেরই ধরনে প্রকাশ করার তীব্র কামনায় এই তরুণ কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে সক্ষম হলেন। রবীন্দ্রানুসৃতির অতিরেক বর্জন আর আপন অনুভব প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পাওয়া – দুই-ই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতায় প্রকৃতপক্ষে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাহিত্য-আন্দোলনের প্রকৃতি ঈষৎ কৌতুকময়ভাবে উপস্থাপিত। একই সঙ্গে সাহিত্য-ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক প্রবণতার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এবং বুদ্ধদেব সমর্থন করেছেন সে কথা – সাহিত্যে এক এক সময়ে পৃথক পৃথক সাহিত্যধারা প্রবর্তিত হয়। একই সাহিত্যধারার পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রতিবন্ধক। কল্লোল গোষ্ঠী রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্যে নতুন এক ধারার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

সে প্রবণতার মধ্যে কিছুটা ছিল জেদ, বেশ কিছু সাহিত্যমূল্যহীন রচনাও দেখা দিয়েছিল সেই সময় পর্বে। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে গিয়ে রচিত নতুন সাহিত্য-স্রোতের প্রথম বেগের আবিলতা কেটে গিয়ে স্পষ্টতা এল পরের যুগে। মননচর্চার স্থিরতা অর্জনের প্রয়াস সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) সম্পাদিত 'পরিচয়'-এ দেখা দিল ১৯৩১-এ। 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬৫) পত্রিকা হয়ে উঠল নতুন কবিগণের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা এনে দিল চিন্তনসমৃদ্ধ স্বচ্ছতা। নজরুল-কবিতার উচ্চ সুর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪ ১৯৮৮) কবিতার প্রাণস্পর্শী স্বরের পরে বাংলা কবিতায় দেখা দিল সংহতি এবং মননঘনত্ব। কবিতার বিষয় আর ব্যবহৃত শব্দ বিষয়ে উদারতা; কবিতা ও গদ্যের সম্মিলনের ইঙ্গিত স্পষ্টতা লাভ করল এ সময়েই। সাহিত্যে এরূপ পরিবর্তনের সাধারণ কারণ সময়ের চাপ। তবে এসব প্রবণতার সাহিত্য-ব্যবহারের যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় তা কাটিয়ে ওঠেন নানা কবি নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে। বিশ শতকের তিন ও চারের দশকে বাঙালি কবিদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে স্বকীয়তায় স্থিত হওয়া।

আধুনিক বাঙালি কবিগণ একই সুরে কবিতা রচনা করেননি। বুদ্ধদেব বসুর মতে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) লিখেছেন দর্শন, ঘ্রাণ, ত্বক - প্রভৃতি ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভবের কবিতা। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যায় চিন্তন-প্রাধান্য আর বৈনাশিক চেতনার সম্মিলিত প্রকাশ। আবার অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৪) সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনে কবিতা লিখেছেন। এই কবিগণ একই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কারণ এরা নানা দিক থেকে বাংলা কবিতায় এনে দিয়েছেন নতুন উপভোগ্যতা। রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবার সচেতন বা অবচেতনে নিহিত প্রয়াস এঁদের কবিতার সাধারণ লক্ষণ। এঁদের মধ্যে কেউ যেমন জীবনানন্দ দাশ পুরোপুরি নিজস্ব স্বর খুঁজে নিয়েছেন। বহু কবি রবীন্দ্রনাথকে একান্ত নিজের করে নিয়ে তার বিরোধিতা করার শক্তি অর্জন করেছেন। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাহিত্য আর আধুনিক জীবনের বিশ্বাসহীনতা, অবসাদ, জীবনবিমুখতা তাদের উপকরণ জুগিয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) রবীন্দ্র কবিতা-পঙক্তির ব্যঙ্গ-তির্যক ব্যবহার করেছেন তার কবিতায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবন-বিনাশক অপসত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বাক্য আপন কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) রবীন্দ্র-অনুরাগী হলেও আঙ্গিকের বিচিত্রতায়, কবিতায় গদ্য বিষয়ের ব্যবহারে নবীনত্ব সৃষ্টি করলেন। অথাৎ এই কবিদের অনেকেই রবীন্দ্র-ঐশ্বর্যকে নানাভাবে ব্যবহার করে বাংলা কবিতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) রবীন্দ্র-কবিতার পঙক্তিকে ঈষৎ বক্রভাবে নিজস্ব অভিপ্রায়ের প্রকাশ-মাধ্যম করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ এবং সমকালের কবিগণ অচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছিলেন। ফলে তাদের নিজস্বতা লুপ্ত হয়েছিল। আধুনিক কবিগণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গৃহীত ঐশ্বর্য অকুণ্ঠভাবে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। এই কুণ্ঠাহীন, প্রত্যয়-বলিষ্ঠ নির্ভীকতা তাদের স্ব-প্রত্যয় ও সাবালকত্বের প্রমাণ । বাংলা কবিতার বিপন্নতার কালে এই কবিগণ সেই প্রাথমিক সত্যকে প্রমাণ করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দর নিজের জীবন দিয়ে খুঁজে নিতে হয়। কোনো গুরু তা প্রদান করতে পারেন না। আর কবিতার নির্মাণশৈলী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। কঠোর পরিশ্রমে কবিকে তা অর্জন করে নিতে হয়।

নজরুল আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – এই বিশ বছরে বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনির্ভরতা কাটিয়ে হয়ে উঠেছে স্বনির্ভর। রবীন্দ্র-অনুসরণ-প্রবণতা একেবারে মুছে গেছে। অবশ্য শক্তিমান আধুনিক কবিদের অনুসরণের চেষ্টা করছেন অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিগণ। এক্ষেত্রে বিস্ময় বা আশঙ্কার কিছু নেই। এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। পুরাতনের অনুসরণের প্রবলতা থেকে উঠে আসে নতুন সম্ভাবনা। তবে কবিতার করণকৌশল তথা প্রকরণকে অধিক গুরুত্ব দানের একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এই তরুণ কবিদের রচনায়। – এ ব্যাপারটি সমর্থন করা যায় না। কলাকৌশলকে অধিক মূল্যদান-প্রবণতা সাহিত্যের রিক্ততার দ্যোতক। কলাকৌশল কবিতার বক্তব্যের আধার মাত্র – কবিতা নয়। কবির নিজের কথা, আপন অনুভব কবিতায় ব্যক্ত হয়। প্রকরণ কবির কথাকে ধারণ করে। বলার বিষয়ের মহত্ত্ব, বিস্তৃতি আর গভীরতা; তার প্রকাশ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রকরণকে দেয় সম্পূর্ণতা। অনুভবের, বলার বিষয়ের স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ব্যাপারেও কবিদের সচেতন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সমৃদ্ধতম উৎস। বর্তমান কাল রবীন্দ্র-আচ্ছন্নতার কাল নয়। একালে বাংলা কবিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার ব্যাপ্ত সমৃদ্ধিকে অস্বীকার করে না কোনোভাবে। রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে, স্বীকার করে তার রচনাকে ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই পরবর্তী বাংলা কবিতার পরিণতির আর বিকাশের সম্ভাবনা নিহিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে তাকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করার শক্তির মধ্যেই বাংলা কবিতার ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা বর্তমান। বুদ্ধদেব বসুর মতে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরসাধকদের কাছে হয়ে উঠেছেন অপরিহার্য।

১০.৫ ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে ব্যক্ত লেখক-মনোভঙ্গি আলোচনা

ধ্রুপদি সাহিত্য বিশেষত মহাকাব্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়। নবীন লেখক প্রাচীন মহাকাব্যের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পান তার সন্ধানী দৃষ্টিতে।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-উত্তর যুগের অন্যতম আধুনিক সাহিত্যিক। 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রয়েছে তার সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। বিশ শতকীয় প্রাবন্ধিক-সুলভ তন্ময়তা আর মন্ময়তার মিশ্রিত মনোভঙ্গিও এ প্রবন্ধে বিম্বিত হয়েছে।

প্রবন্ধের সূচনায় আছে মহাকাব্য থেকে বালকবয়স কী পেতে পারে যেন তারই স্মৃতিমেদুর বিশ্লেষণ। লেখকের বালকমন কেমনভাবে উপভোগ করেছিল, আদি, মহাকাব্য রামায়ণের একটি কিশোরপাঠ্য সংস্করণ; তা বিশ্লেষিত হয়েছে এখানে। কাব্যসুরভিত সেই 'ছোট্ট রামায়ণ' লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)। সে রামায়ণের মধ্যে বালকের ভালো লেগেছিল মুক্ত প্রকৃতির বুকে অরণ্যবাসের বন্ধনহীন। আনন্দ আর রাক্ষস-রাক্ষসীদের সঙ্গে রামের যুদ্ধের রোমাঞ্চক বিবরণ। কিশোর মনের স্বাভাবিক বাধামুক্ত বহির্জীবন-আকর্ষণ এভাবেই তৃপ্ত করে এই মহাকাব্যে।

আর একটু বড়ো হয়ে লেখকের হাতে এসেছিল বাল্মীকি-রামায়ণের কৃত্তিবাস কৃত বাঙালি সংস্করণ। একটি মহাকাব্যকে পরের যুগের নির্দিষ্ট এক প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ একান্ত নিজেদের মতো করে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেই কামনা-পূর্তির ফল। কিন্তু কাব্যটি কেবলমাত্র করুণ-রস-প্রিয় বাঙালি মনকে তৃপ্ত করে। বাল্মীকি রচিত মূল কাব্যে জীবনের যে বিরাট রূপ, মনুষ্যত্বের যে উদার রূপ প্রকাশ, জীবনপ্রীতির যে বলিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষিত হয় তা কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনুপস্থিত। এখানে বুদ্ধদেব বসু কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে আপন মতামত বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেননি। তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের চরিত্র-মানসিকতাকে করে তুলেছেন একান্তই বাঙালি। বাংলার আবহ চিত্রিত হয়েছে তার রামায়ণে। মূল রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতা-লক্ষ্মণের স্বাভাবিক মানবিক ত্রুটি বর্জন করেছেন কৃত্তিবাস। ফলে তাঁর সৃষ্ট রাম, লক্ষ্মণ, সীতা হয়েছে আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা ও পত্নী।

বুদ্ধদেব বসুর মতে এর ফলে আদি মহাকাব্যের মূল বিশেষত্ব আসক্তিহীন, মমত্বশূন্য, পূর্ণ বাস্তব চিত্রণের দিকটি ক্ষুন্ন হয়েছে।

মহাকাব্য কৃত্রিমতাহীন ভালো-মন্দয় মেশানো বাস্তবের সম্পূর্ণ প্রকাশ। সচেতন শিল্পকর্ম হিসেবে রচিত হয়নি মহাকাব্য। জীবনের কোনো দিক সেখানে উপেক্ষিত হয়নি। ভালো আর মন্দ – জীবনের দুটি দিকের চরমতম রূপ নিরাসক্ততাবে উপস্থাপিত হয় মহাকাব্যে। রামায়ণ আর মহাভারত - দুই মহাকাব্যেই লক্ষিত হয় এই বিশেষত্ব। তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণের আকার এবং জীবনাদর্শনের পরিসর কম। সে কারণে রামায়ণ তুলনায় সংহত এবং কবিত্বের দিক দিয়ে অধিক ঐশ্বর্য সম্পন্ন। মানবজাতির প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে রামায়ণের আছে নিজস্ব একটি মূল্য। কারণ রামায়ণ মহাভারতের পূর্বের রচনা-- পণ্ডিতবর্গ এ মতে পোঁছেছেন যুক্তিসিদ্ধ বিশদ আলোচনার পর।

বুদ্ধদেব বসু রামায়ণ-নায়ক রাম চরিত্র আর রামায়ণের সংগতির অভাব সম্পর্কে আপন অভিমতকে ভাষাবদ্ধ করেছেন এ প্রবন্ধে। নায়ক হিসেবে রাম আদর্শ চরিত্র নন। বহু ন্যায়হীন কাজ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে রাম চরিত্র বিচারের ভিত্তি হওয়া উচিত ভারতীয়দের মনে প্রতিষ্ঠিত তার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন দক্ষ কুটনীতিজ্ঞ রাম বালী ও রাবণকে বধ করে যথাক্রমে সুগ্রীব ও বিভীষণকে রাজত্ব প্রদান করেন। তা ছাড়া চণ্ডাল ও বানরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে আর্য এবং অনার্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেন তিনি। এই মহৎ কাজের জন্য জনমন ক্রমে তাকে অবতার পুরুষ বলে গ্রহণ করেছে। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে বলেছেন জুলিয়াস সিজার-এর মতোই রাম উত্তম সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা। কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে মেলাতে পেরেছেন বলে কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ কারণেই রাম মহৎ নন। রাজশেখর বসুর মতে আধুনিক মানদণ্ডে রাম চরিত্রের বিচার সম্ভব নয়। একথা বুদ্ধদেব মানেন। কিন্তু তার মতে রাম চরিত্রের যথার্থ মহত্ত্ব এইখানে যে তার মধ্যে আছে মানবতার চিরন্তন আদর্শ। কর্মেই মানুষের অধিকার; ফলে নয় - এই চিরকালের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামায়ণ-রচয়িতা আর মহাভারতকার। রামায়ণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেবের নিজস্ব দৃষ্টির প্রমাণ রয়েছে।

তার মতে একারণেই সীতা-উদ্ধারের জন্য দুঃখভোগ, বন্ধুক্ষয়ী সংগ্রামের পরও তাকে ত্যাগ করেন রাম। এবং এই কর্ম সম্পাদনকালে তিনি ধৈর্যশীল, স্থির ও কামনাহীন। দুঃখ বা সুখ কোনো কিছুতেই তিনি বিচলিত নন। সামান্যমাত্র অবসরের সদর্থক ব্যবহারে তিনি নিপুণ। তাই সীতা-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হবার আগের বর্ষা-শরতের প্রকৃতি-সৌন্দর্য ভোগ করতে পারেন তিনি ধীরভাবে। বালীনিধন বা সীতা উদ্ধার – কোনো কর্মেই তার মধ্যে দেখা যায় না বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য। সীতার পাতাল প্রবেশে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হলেও রাম সংযত করেন নিজেকে। রাজ্যপালন রূপ কর্তব্যসাধন, লক্ষ্মণ বর্জন — সব কাজই তিনি করেছেন স্থিরভাবে।

বুদ্ধদেব বসুর এ মত যথার্থ যে বাল্মীকির রাম চিরকালের মহৎ মানুষ। তাই তিনি বালী বধ, সীতা বজন, নিরপরাধ শুদ্রতপস্বী শম্বককে হত্যার মতো হীন কাজ করেন। রামের মানবত্ব এসব কাজের দ্বারা প্রমাণিত। তাই বাল্মীকি-চিত্রিত রাম অবতার নন, মানুষ। এইসব হীনতার সঙ্গে তার চরিত্রে লক্ষিত হয় ধীরতা, কামনাহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রকাশ। তুচ্ছতম রণ-উপকরণ, বনচারী বানরদলের মতো রণকৌশলে দীন সেনাদল নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন সুসভ্য রণদক্ষ রাক্ষসদের সঙ্গে। প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন রাম কেবল আত্মশক্তিকে সম্বল করে; অবিচলিতভাবে ভোগ করেন দুঃখ। এভাবে হীনতা আর কর্তব্যনিষ্ঠা, দুঃখ আর ত্যাগের মধ্য দিয়েই বাল্মীকি রামকে করে তোলেন আদর্শ মানুষ।

বুদ্ধদেব বসুর মতে রামায়ণ আদি মহাকাব্য। তাই আধুনিক সাহিত্যের মতো এ মহাকাব্যে সব চরিত্রের পূর্ণ চিত্র অনুপস্থিত। বহু চরিত্রের কার্যকলাপে আছে সংগতির অভাব। রামায়ণের বিশেষত্ব রচয়িতার মৌলিক সহজাত সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাই বালীর পত্নী তারা স্বামীর মৃত্যুতে শোকার্ত; আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শোক অপসৃত, সে মদ্যপানে বিমুখ নয়। স্বামীহন্তা সুগ্রীবের পক্ষে কথা বলতেও তার বাধে না। বাস্তবে এরকমই হয়। আর সেই কঠিন বাস্তবকে নিরাসক্তভাবে চিত্রিত করতে পারেন বাল্মীকি।

উর্মিলা, লক্ষ্মণ, কৈকেয়ী — এইসব চরিত্রের পূর্ণ রূপ আঁকেননি তিনি। রাম-সীতার যুগ্ম দাম্পত্যের চিত্রও তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। রামের সীতাবিরহও ততটা গুরুত্ব পায়নি রচনায়। এভাবে তিনি কিন্তু পাঠককে সুযোগ দেন চরিত্রের দুঃখ-সুখের সহমর্মী হওয়ার, এমনকি একাত্ম হওয়ার। এখানেই আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আদি মহাকাব্যের প্রভেদ। বোঝা যায় যে ধর্মগ্রন্থ বা প্রাচীন ইতিহাস হিসেবে বুদ্ধদেব বসু রামায়ণকে দেখেননি। তিনি রামায়ণকে দেখেছে মানব-চরিত্রের সার্থক সাহিত্যিক রূপচিত্রণ হিসেবে। আধুনিক সাহিত্য সবই চিত্রিত করে। পাঠকের, উপভোক্তার কল্পনা-সক্রিয়তার অবকাশ সে সাহিত্যে নেই। রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে সে পাঠককে নিজের মতো করে কাহিনিকে গ্রহণ করার, চরিত্রকে নিজস্ব ধরনে গড়ে নেওয়ার সুযোগ দেয়। তাই কিশোরের কল্পনাতেও সে কাব্য নিজস্ব সম্পদ হয়ে ওঠে। আবার বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীও তাকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তার দৃষ্টান্ত।

সর্বোপরি দোষেগুণে জড়ানো মানুষের পূর্ণায়ত রূপ পাওয়া যায় রামায়ণে। সে রূপ নির্মাণে আশ্চর্য সংযত নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন রামায়ণ-রচয়িতা।

বুদ্ধদেব বসুর সংস্কারমুক্ত মনের, মানবতার সাহিত্য রূপায়ণে বিশ্বাসী মানসিকতার প্রমাণ দেয় ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটি। তার এই মানসিকতার পরবর্তী ফসল ‘মহাভারতের কথা’ (১৯৭৪) নামের সংকলনটি। প্রখ্যাত এ গ্রন্থটি অনুভব ও মননের যুগ্ম প্রকাশে হয়ে উঠেছে অপরূপ।

১০.৬ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মননে ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’

বুদ্ধদেব বসু সূচনা থেকে মোটামুটি চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা করেছেন তার ‘বাংলা শিশুসাহিত্য' নামের প্রবন্ধটিতে। ১৯৫২ সালে লেখা প্রবন্ধটিতে অনুভব আর মননের সুষম অন্বয় লক্ষিত হয়। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু যথার্থই লক্ষ করেছেন যে বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম হয়েছিল কয়েকজন

দরদি অথচ প্রকৃত সাহিত্যিকের লেখনীতে। শিশু-কিশোরদের ভালোবেসে তাদের ‘মনের চোখ ফোটানোর’ দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। একান্তভাবে নিজেদের একাজে নিয়োজিত করেছিলেন বলেই বয়স্কপাঠ্য কোনো কিছুই তারা রচনা করেননি।

বুদ্ধদেব বসুর এ মত সত্য যে বাংলা শিশুসাহিত্য নানাভাবে রায়চৌধুরী পরিবারের কাছে ঋণী। তারপর তিনি আপন মতের সমর্থনে দিয়েছেন কিছু তথ্য। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছিলেন টুনটুনির বই' (১৯১৩)। বাংলার আর বিদেশের লোককথার এমন শিশুতোষ সংকলন কমই আছে। তারই ভাই কলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০) পুরাণের গল্প আর বিদেশি ধ্রুপদি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি কিশোরদের। তবে বুদ্ধদেব বসুর মতে উপেন্দ্রকিশোর-কন্যা সুখলতা রাও আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায় যেমন সদ্য পড়তে শেখা ছোটোদের আর স্কুলে যেতে শুরু করা কিশোরদের মন ছুঁয়ে যাওয়া। কাহিনি লিখেছেন তেমনটি লিখতে পেরেছেন খুব কম লেখক।

সুখলতা আর সুকুমার রায়ের মধ্যে প্রথম জনের গল্পে যে চিরকালীনতা বর্তমান-- তাও বুদ্ধদেব বসুর নজর এড়ায়নি। সুখলতা অবশ্য গ্রিমভাইদের সংগৃহীত রূপকথার আদলে লিখেছেন তার গল্প। রূপকথার স্বাভাবিক বিশ্বজনীনতা আর সুখলতার সরল মধুর লিখনরীতি – দুয়ে মিলে তার গল্প সরে পড়তে শেখা ছোটোদের মনের মতো হয়ে উঠেছে অনায়াসে।

তুলনায় সুকুমার রায়ের ‘পাগলা দাশু’র গল্পগুলি সময় পালটে যাওয়ার কারণে ততটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে না। সুকুমার রায়ের প্রকৃত কৃতিত্ব এখানে যে তিনি ছোটোদের কবিতাকেও করে তুলেছেন কাব্য-স্পন্দন যুক্ত প্রকৃত কবিতা। উদাহরণ আর যুক্তি দিয়ে সুকুমার-সাহিত্যের এদিকটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। সুকুমার রায়ের আর একটি কৃতিত্ব 'ননসেন্স’ কবিতা বা খেয়াল রসের কবিতা-গল্প রচনা। এক্ষেত্রে তিনি এওয়ার্ড লিয়র এবং লুইস ক্যারল-এর মতোই প্রতিভাবান। বিশেষ করে ‘তোরঙ্গশব্দ’ বা দুটি শব্দের সংযোগে নতুন শব্দ নির্মাণে দক্ষ ছিলেন তিনি।

সুকুমার রায়ের আর একটি বিশেষত্ব শব্দতত্ত্বের সাহিত্যিক উপস্থাপনের দক্ষতা। ‘খাইখাই’ কবিতাটি ভিন্ন ‘অবাক জলপান ‘চলচ্চিত্তচঞ্চরি’ শব্দকল্পদ্রুম নাটিকাগুলি তার শব্দজ্ঞানের প্রমাণ। সুকুমার রায়ের রচনার এই দিকটি সম্পর্কে আলোচনা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-বিশ্লেষণ শক্তির অনন্যতার প্রমাণ বলা যায় । বিচিত্র আর অপ্রত্যাশিত মিল যোজনাতেও তিনি দক্ষ। এ বিষয়ে তার নিপুণতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চেয়েও অধিক। কারণ বুদ্ধদেব বসুর মতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বেশির ভাগ সময়ে রচনা করেছেন ছন্দোবদ্ধ পদ্য। আর সুকুমার রায়ের রচনা প্রায়শ হয়ে উঠেছে বয়স্ক-উপভোগ্য প্রকৃত কবিতা।

রায়চৌধুরী পরিবারের প্রসঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রবর্তিত গল্প, কবিতা, নাটক, ধাঁধা, ছবিতে সমৃদ্ধ শিশু-কিশোর পত্রিকা ‘সন্দেশ'-এর কথাও বিস্মৃত হননি বুদ্ধদেব। বাংলার ছেলেদের মানসপুষ্টিতে এ পত্রিকার দান যে ভোলা যায় না তা আপন কৈশোর-স্মৃতিচারণ সূত্রে ব্যক্ত করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ ছিল গড়ে ওঠার যুগ। বিদেশের অমূল্য কিশোর সাহিত্য এবং ধ্রুপদি সাহিত্যের অনুবাদ করেছিলেন এযুগের সাহিত্যিকগণ স্বদেশের সাহিত্যকে পুষ্ট করার জন্য। তারা কঠিন শ্রমে ভূমি কর্ষণ করেছিলেন। তারই ফলে বাংলা শিশুসাহিত্য দ্রুত পরিণতি লাভ করেছিল।

বুদ্ধদেব বসু বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগকে তুলেছেন। সরল সংকলন-প্রধান একান্ত শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের যুগ। ‘সন্দেশ’ যখন সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায় তখনই মোটামুটি অবসান ঘটে এ যুগের।

পরের যুগের কিশোরসাহিত্য তথা শিশুসাহিত্য সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক’ পত্রিকাটিতে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে ওঠে। এ যুগের লেখকগন শিশুসাহিত্য আর বয়স্কপাঠ্য সাহিত্য - দুই ধারার সাহিত্য রচনাতেই ছিলেন নিপুণ। এসময়ে কিশোরসাহিত্যে উপাদান বৈচিত্র্য দেখা দিল। রচিত হতে লাগল ঘটনাপ্রধান রোমাঞ্চক অভিযান কাহিনি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর অভিধান-আখ্যান আর কৌতুক আখ্যান। এযুগের শিশুসাহিত্য প্রকৃত অর্থে কিশোরসাহিত্য এবং এ সাহিত্য সমভাবে বয়স্কদেরও

উপভোগ্য। অনেক সময় লেখক সচেতনভাবেই এসব লেখা বয়স্ক ও কিশোর উভয়ের উপভোগ্য করে রচনা করে থাকেন। "ভারতী" গোষ্ঠী আর 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকবৃন্দের রচিত কিশোরসাহিত্যের এটাই মৌল লক্ষণ।।

এ সময়ের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাকে বলেছেন প্রকৃত কিশোরসাহিত্য। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞাননির্ভর অভিযান কাহিনিতে তিনি দেখেছেন সাবালকপাঠ্য আখ্যানের সম্ভাবনা।

শিবরাম চক্রবর্তীর কৌতুক দৃষ্টি শক্তির অসামান্যতা স্বীকার করেছেন বুদ্ধদেব। আবার পুনরাবৃত্তিমূলক কাহিনি রচনা, শ্লেষ-যমকের অতিরেক যে তাঁর ত্রুটি একথাও বুদ্ধদেব স্পষ্ট করেই বলেছেন। কৌতুক-কাহিনি রচয়িতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত রবীন্দ্রলাল রায়ের লেখার কথা তিনি বিস্মৃত হননি। এ সত্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি যে বাংলায় বিশুদ্ধ কৌতুক আখ্যান রচনা বর্তমানে কিশোরসাহিত্যেই সীমিত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বক্তব্য-গূঢ়, ব্যং-তির্যক স্বাদু ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে রাজনীতিও বর্তমানে শিশুসাহিত্যে স্নান করে নিয়েছে।

কিন্তু লক্ষণীয় ভূতের গল্প আর গোয়েন্দা গল্পও যে এ যুগে কিশোরসাহিত্যে দেখা দিয়েছে, প্রবলভাবে তা তিনি উপেক্ষা করেছেন।

অবশ্য লীলা মজুমদারের কিশোর সাহিত্যের মূল্যায়নে অবশ্য বুদ্ধদেব যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শিশুসাহিত্যের এই দ্বিতীয় যুগে লীলা মজুমদারের মতো লেখিকা আছেন – যিনি 'সন্দেশ'-এর যুগের মতোই ছোটোদের নায়ক করে তাদের ভাষায়, তাদের মতো করে লিখেছেন ছোটোদের মনের কথা। স্নিগ্ধ কৌতুক, অসম্ভব আর বাস্তবের সুষম সংযোগের সঙ্গে গদ্যভাষার ছন্দময়তায় লীলা মজুমদার হয়ে উঠেছেন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'পাগলা দাশু' আর 'দিন-দুপুরে'র তুলনা করে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন লীলা মজুমদার ও সুকুমার রায়ের রচনার সাদৃশ্য এবং স্বতন্ত্র।

বুদ্ধদেব বসুর মতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বিরল প্রতিভার অধিকারী। সময়ের ঘূর্ণাবর্ত বা সমকালের উজ্জ্বল ব্যক্তি-প্রতিভা কোনো কিছু তাঁকে আলোড়িত করে না। তিনি স্বভাবে স্থিত চিরকালের শিশু-কিশোর সাহিত্যের লেখক। তাঁর রচনায় যে অনায়াসে মানবজীবনের মূল নীতি রূপায়িত হয় তা বুদ্ধদেব বসুর নজর এড়ায়নি। শিশুদের ভালোবেসে তিনি শিশুদের জন্য লিখেছেন তাঁর আশ্চর্য ছন্দোময় ভাষায় নানা আখ্যান। হিংসা-ঘৃণা-প্রেম – জীবনের সব দিকই রূপ লাভ করেছে তার কলমে। সে রূপায়ণে বাস্তব উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু বাস্তবের গ্লানি সেখানে অনুপস্থিত। তার সাহিত্যের আর এক বিশেষত্ব জীবনের প্রতি গভীর সম্ভ্রমের বোধ। সকল প্রাণীই সেখানে শ্রদ্ধেয়। হত ও হন্তা – অস্তিত্ব রক্ষার চিরন্তন সংগ্রামের সত্যের মানদণ্ডে সমান মূল্যবান হয়ে উঠেছে তার সাহিত্যে। মানুষ আর পশু, পাখি, ফুল, পাতা আকাশ অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বের সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব – অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মূল ভিত্তি। অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্যের এই বিশ্লেষণে বুদ্ধদেব বসুর অনুভব-গভীরতা আর মনন-তীক্ষ্ণতার পরিচয় স্পষ্ট।

বুদ্ধদেব বসু এই মত সমর্থন করেছেন যে শিশুসাহিত্য তখনই সার্থক হয় যখন তা হয় সর্বজনীন। আর সর্বকালের ধ্রুপদি সাহিত্য সব সময়েই শিশুউপভোগ্য। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতে শিশুদের পড়তে শেখানো আর ঠিক তার পরের ধাপের শিশুদের জন্য দরকার পৃথক বই। এই দুই ধরনের বইয়ের রচয়িতা হিসেবে অনন্য যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুসি’ (১৮৯৭)। এর তুল্য বই বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। কারণ যোগীন্দ্রনাথ সরকার শিশুদের ভালোবেসে লিখেছেন এ বই। সেই ভালোবাসার সঙ্গে মিশেছে, অভ্রান্ত রুচি আর যথাযথ রচনাশক্তি। ফলে তাঁর লেখাতে ফুটেছে ছবি। যে ছবি ছোটোদের আকৃষ্ট করে। তাঁর বর্ণপরিচয়ের ভাষানির্মিত ছবিগুলি নিজস্বগুণে চিরদিনের জন্য জীবন্ত হয়ে আছে।

‘হাসিখুসি’-র সমতুল্য গ্রন্থ বাংলায় আর একটি মাত্র আছে – তা রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'। এটাই বুদ্ধদেবের মত। তার মতে রবীন্দ্রনাথ অসীম যত্নে রচনা করেছিলেন এই গ্রন্থ। ফলে বইটি হয়েছে বর্ণপরিচয়ের উত্তম গ্রন্থ এবং একই সঙ্গে সাহিত্যগুণে

ঐশ্বর্যময়। ছন্দে, মিলে, ভাষাচিত্রে – সব দিক দিয়ে শিশুদের শেখার উদ্দেশ্য ক্ষুন্ন না করেই বইটি হয়ে উঠেছে তাদের সাহিত্যরস আস্বাদের উৎস।

প্রবন্ধ রচনাকালীন সময়ে বাংলা শিশুসাহিত্যে হত্যা কাহিনির আধিক্য বা শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকায় উপদেশবহুল আখ্যান-বহুলতা বুদ্ধদেব বসুকে হতাশ করেনি। তার মতে এরূপ রুচি-বৈকল্য কেবল শিশু কিশোর সাহিত্যে নয়, সামগ্রিকভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে। তার জন্য বিষণ্ণতা বোধ করা অর্থহীন। কারণ মানুষের মনে ভোগবাসনার সঙ্গে অমৃত-তৃষ্ণা চিরকালই আছে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যে এত উন্নত যে তাকে দুর্বল করার সাধ্য সাময়িক রুচিবিকৃতির নেই। বাংলা কিশোর-শিশুসাহিত্যের এ সমৃদ্ধির কারণ বাঙালির স্বভাবগত গৃহপ্রিয়তা তথা শিশু প্রীতি।

'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর গভীর সাহিত্যবোধ আর নিপুণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। একই সঙ্গে আছে তুলনাত্মক সাহিত্য-বিচার-প্রবণতার প্রকাশ।

বুদ্ধদেব বসু শিশুসাহিত্য বিচারকালে পড়তে শেখানো আর বর্ণপরিচয়ের পরে পড়ার মতো বইয়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বাংলা শিশুসাহিত্য প্রবন্ধটিতে। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' আর রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর আলোচনায়। শিশু সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা এর পূর্বে হয়েছে, বলে মনে হয় না।

সুকুমার রায় আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষত্ব উদাহরণ নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনায় স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন বুদ্ধদেব বসু। এবং কখনই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আবেগবাহুল্যে আচ্ছন্ন হয়নি।

সংক্ষেপে বলা যায় এ প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব স্বাধীন সাহিত্য-বিচার পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১০.৭ ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে ব্যক্ত বুদ্ধদেব বসুর অভিমত বিশ্লেষণ

‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু রবী: প্রভাবিত এবং রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত বাঙালি কবিদের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ১৯৫২ সালে রচিত এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু কেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন এবং কীভাবে সেই কঠিন কর্ম সম্পাদন করলেন কল্লোল গোষ্ঠীর কবিগণ যুক্তি-তথ্য দিয়ে তা বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ছিলেন এই কবি গোষ্ঠীর একজন। কাজেই তার আলোচনার স্বতন্ত্র একটি মূল্য বর্তমান এ সত্য মেনে নিতেই হয়।

তার মতে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্য জগতে ছিল না সমৃদ্ধি। দাশরথি রায়ের পাঁচালির শব্দচাতুর্য, রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিগাঢ় গীতিকবিতা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যপ্রধান কবিতা আর মাইকেল মধুসূদনের গম্ভীর উচ্চগ্রামের মহাকাব্য ভিন্ন আর উল্লেখ্য কিছু রচনা বাংলা সাহিত্যে তখন ছিল না। – এটাই বুদ্ধদেব বসুর মত। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় যার প্রভাব স্পষ্ট সেই বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), সম্পর্কে বুদ্ধদেব কিছুই বলেননি। রবীন্দ্রনাথ যে উজ্জ্বল রচনা-সম্পদে বাংলা কবিতাকে ধনী করে তুললেন বিহারীলালই যে সেই আত্মানুভব-সমৃদ্ধ কবিতার প্রথম কবি তা মনে রাখেননি বুদ্ধদেব।

তাঁর মতে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই দুর্বলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-দীপ্ত সাহিত্য-সৃষ্টিক্ষম বিশাল সত্তার প্রকাশ ঘটল। এর ফল হল দুটি – একদল কবি সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-অনুবর্তন শুরু করলেন। আর একদল কবি-সাহিত্যিক নিন্দার মাধ্যমে নস্যাৎ করতে চাইলেন এই মহৎ প্রতিভাকে।

কবিতার ছন্দ, মিল, ভাষা, অলংকার-ব্যবহার, বিষয় – সব দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ স্থাপন করলেন তা ছিল একই সঙ্গে সহজ এবং কঠিন। রবীন্দ্র-কবিতায়

দুরূহতম বিষয়ের, জটিল অনুভবের অনায়াস বর্ণময় প্রকাশরূপ দর্শনে মুগ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথের সময়ের তরুণ কবিগণ – যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে। তাঁদের মনে হল রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথের অনুসরণই প্রকৃত কবিতা রচনার উপায়। ফলে তরল আবেগের ছন্দময় প্রকাশের মাধ্যে শেষ হয়ে গেল তাদের কবিতা রচনাশক্তি। অনুভবের সংযমহীন, অমার্জিত, শিথিল প্রকাশকে তাঁরা কবিতা রচনার একমাত্র পথ বলে মনে করলেন। তাই বুদ্ধদেব এদের 'স্বভাব কবি' সংজ্ঞা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাবলীল রচনাভঙ্গীর আপাত সহজতায় মগ্ন হয়ে লুপ্ত হল তাদের স্বাতন্ত্র্য। তবে এই কবিদের আত্মালুপ্তি পরবর্তী কবিদের রবি-অনুকরণের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। এ কারণেই এঁরা স্মরণযোগ্য।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। কারণ তাঁর মতে রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে তার লেখার শক্তি সকলের চেয়ে ভালো, সব দিক দিয়ে তিনি সে সময়ের প্রতিনিধি আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদও স্পষ্ট। তথাপি তিনি স্বতন্ত্র অর্জন করতে পারেননি। তার কবিতার বিষয়ও রবীন্দ্র কবিতার মতোই ঋতু-সৌন্দর্য, গ্রামের ছবি, দেশপ্রীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে অনুভবের সংরক্ত, উষ্ণ, আন্তরিক প্রকাশ। আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর মতে নেই অনুভূতির আন্তরিক উত্তাপ। তিনি কবিতা লেখার জন্য গড়ে নিয়েছেন কিছু ভাব। অন্তরের গভীর অনুভবকে রূপদানের চেষ্টা তিনি করেননি। তার কবিতায় প্রকরণের দিক দিয়েও নেই মানার প্রকাশ। রাবীন্দ্রিক ছন্দের মাধুর্য তার ছন্দে নেই; তার ছন্দ শুধু উদ্দেশ্যহীন ধ্বনি-চপলতা মাত্র। রবীন্দ্র-অনুসারী অন্যসব কবিদের রচনায় এই ত্রুটিগুলিই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সুখশ্রাব্য অথচ গভীরতাহীন কবিতার আধিক্য দেখা গেল।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-উত্তর যুগের সূচনা করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তার মতে কৈশোর মফসসলে কেটেছিল বলে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। বিবিধ বিচিত্র জীবিকা, সৈন্যদলের অভিজ্ঞতা আর

ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য নজরুলকে করে তুলেছিল অনন্য-সাধারণ। যদিও স্বতন্ত্রতার সতর্ক চর্চা তিনি করেননি। তার প্রেমের কবিতায় লক্ষিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। বহু ক্ষেত্রেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছেন। কবিতায় কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথ পুরোপুরি অবলম্বন করেননি।

নজরুলের কবিতায় আছে স্বভাবকবি-সুলভ আবেগের অসংযত প্রকাশ। এ ছাড়া তার মধ্যে নেই ক্রমপরিণতির আভাস। তথাপি তিনিই প্রথম বাংলা কবিতায় নতুনের তৃষ্ণা জাগিয়ে দিলেন। তারই দূরবর্তী ফল মোহিতলালের বলিষ্ঠ প্রাণাবেগ-সমৃদ্ধ কবিতা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গভীরতাহীন হলেও অন্য ধরনের কবিতা-সম্ভার। বুদ্ধদেব বসুর মতে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর আবির্ভাবের ভূমি তৈরির কাজ করেছিলেন এই কবিগণ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মত পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় কি? রবীন্দ্রানুসারী কবি হলেও অকাব্যিক চলিত শব্দের ব্যবহারে, সমকালের রাজনীতিকে কবিতার বিষয় করে তুলে, গ্রাম্য দৃশ্যের শব্দরূপ নির্মাণে নিজস্ব ভুবন কিছুটা তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ‘সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই’ - এমন বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। সে অর্থে সার্বিক বিদ্রোহ না থাকলেও দেহকেন্দ্রিক কামনা-বাসনার কাব্যরূপ দানে, দেশি-বিদেশি পুরাণ-অনুষঙ্গ ব্যবহারে, সমকালের রাজনীতি বিষয়ে কবিতা রচনায় বিশেষত সাম্যবাদের কাব্য রূপদানে কিছুটা নতুনত্ব তিনি এনেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

তবে বুদ্ধদেব বসুর এ মত সঠিক যে এসবই ছিল বা প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রেক্ষিত নির্মাণ। সার্বিকভাবে কবিতায় রবীন্দ্র-আবিষ্টতার অবসান ঘটালেন ‘কল্লোল গোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকগণ। তারাই দেখিয়ে দিলেন রবীন্দ্র কবিতায় রয়েছে বাস্তব-ঘনিষ্ঠতার অভাব, দেহকামনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে নয় – তাঁকে আত্মস্থ করেই বাংলা কবিতার নতুন যুগের আগমন ঘটালেন তাঁরা। বাংলা কবিতা যে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তা চূর্ণ করে দিলেন এই কবিগোষ্ঠী। অবশ্য 'কল্লোল'-এর রবি-বিরেধিতার মধ্যে ছিল কিছুটা অতিরেক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

সেই আতিশয্য-আবিলতা লুপ্ত হল। “পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকা দুটিকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতা হয়ে উঠল সংহত, মননপ্রদান, সর্ববিধ শব্দ ব্যবহারে সজীব, গদ্য-পদ্যের ভেদরেখা গেল মুছে। প্রতীচ্যের আধুনিক সাহিত্য আর আধুনিক জীবনের সন্দেহ তিক্ত, জীবন সম্পর্কে হাহীন বিমুখ মনোভঙ্গি, অবসন্নতাদীণ ভাব জীবনানন্দ দাশ, (১৮৯৪ ১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) - প্রমুখ কবিদের কবিতায় আত্মপ্রকাশ করল বিচিত্রভাবে। এদের আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ়। তাই রবীন্দ্র কবিতার পঙুক্তিকে স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেননি তারা। প্রকৃত সাহিত্য-আদর্শকে নিজের শক্তিতে অর্জন করে নিতে হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ সত্য প্রমাণিত হল এঁদের রচনায়।

এভাবেই বাংলা কবিতা কুড়ি বছরের মধ্যে (কাজী নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখপাধ্যায়) রবি-মুখাপেক্ষী অপরিণত কৈশোর কাটিয়ে উজ্জ্বল যৌবনের শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করল।

“রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক” প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসুর কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকের প্রত্যাশিত নৈর্ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সাহিত্য-বিশেষত্ব সম্পর্কিত বিশ্লেষণে তিনি কিছুটা সরলীকরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত কবিগোষ্ঠী ও পরবর্তী তরুণ কবিদের আলোচনায় আছে তার সাহিত্য বিচারশক্তির পরিচয়।

পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ কবিদের কবিতায়ও দেখা যায় পূর্বসূরিদের অনুসরণ। এ প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তবে তরুণ কবিগণের প্রকরণমনস্কতাকে তিনি সমর্থন করেননি। তার মতে কবিতার ভিত্তি কবির বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। বক্তব্যের মহত্ত্ব প্রকাশের সাবলীলতা। প্রকরণকে করে তোলে নবীন। বাংলা কবিতার এই স্বতঃস্ফূর্ত সহজ প্রকাশের প্রয়োজন মেটাতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

বুদ্ধদেব বসুর এই মত সত্য যে বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহণ করতে পারে অনায়াসে। তার ফলে কিন্তু সে আর পূর্বজ কবিদের মতো ভক্তিমোহে মুগ্ধ হবে না। বাংলা কবিতা শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের, বাংলা ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উত্তরসাধকগণ তাঁকে স্বীকার করেই আত্মপ্রকাশে সক্ষম হবে। বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত আছে এই ঋণ-স্বীকারের মধ্যেই। বুদ্ধদেব এই সমাপ্তিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে স্বীকার করেছেন। এ স্বীকারকে তার সাহিত্যদৃষ্টির যথার্থতার প্রমাণ বলা যায়।

১০.৮ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর অবস্থান: সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বুদ্ধদেব বসু কেবল কবি বা ঔপন্যাসিক হিসেবে নয় প্রাবন্ধিক হিসেবেও স্মরণীয়। তার প্রবন্ধের বিশেষত্ব সংবেদন ও মননের সুমিত অন্বয় এবং পাঠকমনে নিজস্ব অনুভব সঞ্চার করে দেওয়ার দক্ষতা। তার প্রবন্ধে তন্ময়তা আর মন্ময়তার যে সুষম মিশ্রণ লক্ষিত হয় তা বিশেষভাবে বিশ শতকের বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তী প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষত্ব। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রান্ত পর্বে এরকম প্রবন্ধ লিখেছিলেন কোনো কোনো প্রাবন্ধিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্ত’ (১৮৮৫ পরিবর্ধিত সংস্করণ ১ম নাম "কমলাকান্তের দপ্তর" : ১৮৭৬)-এ শ্রেণির কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তবে তন্ময়তা আর মন্ময়তার সমতা প্রায়শ সে সব প্রবন্ধে রক্ষিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে আমরা মনে করতে পারি ‘বিড়াল’ আর ‘আমার দুর্গোৎসব’ প্রবন্ধ দুটির কথা। প্রথম প্রবন্ধে মন্ময়তা প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বড়ো হয়েছে তন্ময়তা।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেই প্রথম এই উভয় ভাবের সুষম অন্বয় লক্ষিত হয়। তার বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯১৮) আর ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭)-এর ‘কৌতুকহাস্য’ ‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’, ‘মন’ এরূপ প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তার সঙ্গে ছিল তার সহজাত অনুভবকে ভাষারূপ দানের শক্তি। এ দুই বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেব বসুকে করে তুলেছিল অনুভবগাঢ় অথচ বিশ্লেষণ-ঋদ্ধ প্রবন্ধের সফল শিল্পী। আপন অনুভবকে পাঠক-মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন তিনি বিনা আয়াসে।

প্রবন্ধের মূল শর্ত তথ্য আর যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বক্তব্যকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলা। অনুভব-প্রধান প্রবন্ধে লেখক হৃদয় দিয়ে লব্ধ অনুভবকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে উদাহরণের সাহায্যে সুলিখিত। বাক্যবন্ধে উপস্থাপিত করেন। তার যুক্তি অথবা তথ্য পরের যুগে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে। তাতে কিন্তু প্রবন্ধের পাঠ্যমূল্য হ্রাস পায় না।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে দেখা যায় এই অনুভব-প্রাধান্য। ভাষার সৌকর্যে আর বিন্যাস-কৌশলে তার প্রবন্ধ ছাপিয়ে যায় সাময়িকতা। উপলক্ষ্য গৌণ হয়ে গিয়ে পাঠযোগ্যতা পায় প্রাধান্য। তাই ১৯৪৭ সালে রচিত প্রবন্ধ আজও পাঠক-মনে জাগায় প্রাবন্ধিকের অনুভবের অনুরণন। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের সাফলা। বুদ্ধদেব বসু বিবিধ বিষয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ। সমালোচনা-প্রবন্ধ, রম্যনিবন্ধ, ভ্রমণ-কথা আর আত্মজীবনী এই চার ভাগে বিভক্ত করা যায় তার প্রবন্ধসমূহকে। এই চার ভাগের মধ্যে সাহিত্য-আলোচনা আর সমালোচনা প্রবন্ধই তিনি বেশি লিখেছেন। মোট পনেরোটি প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা সংকলিত হয়েছে আটটি সংকলনে। যথা ‘কালের পুতুল' (১৯৪৬), ‘সাহিত্যচর্চা’ (১৯৫৫), ‘রবীন্দ্রনাথ’ : ‘কথাসাহিত্য’ (১৯৫৫), ‘স্বদেশ ও সংস্কৃতি' (১৯৫৭), ‘সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৩), ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’ ১৯৬৬), ‘কবিতার শত্রু ও মিত্র’ (১৯৭৪), ‘মহাভারতের কথা' (১৯৭৪)। এ ছাড়া আছে শার্ল বোদলেয়ার, ফ্রীডরিশ হেল্ডার্লিন এবং বাইনের মারিয়া রিলকে – এদের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব এবং সেই তিনটি কবিতা-সংকলনের ভূমিকা হিসেবে লেখা তিনটি প্রবন্ধ। ইংরেজিতে তিনি বেশ কিছু সাহিত্য আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলি ‘অ্যান একার অফ গ্রিন গ্রাস' (An Acre of Green

Grassঃ ১৯৪৮) আর ‘টেগোরঃ পোট্রেট অফ এ পোয়েট’ (' Tagore: Portrait of A poet) ১৯৬২ - গ্রন্থদ্বয়ে, সংকলিত হয়েছে।

কালিদাসের ‘মেঘদূতম্’-এর অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সেই অনুবাদের ভূমিকা প্রবন্ধটিও প্রসঙ্গত স্মরনীয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ ‘বর্তমান রুশ সাহিত'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছিল এই প্রবন্ধ। সে বছরের চৈত্র সংখ্যা 'কল্লোল'-এ মুদ্রিত হয় তার আর একটি প্রবন্ধ ‘কবি সুকুমার রায়"। প্রবন্ধ দুটি লেখার সময় বুদ্ধদেবের বয়স সতেরো থেকে আঠারো। এই সময়েই তিনি প্রবন্ধ-সংরূপ গঠনে, যুক্তি ও অনুভবের মিশ্রণে এবং বিশ্লেষণে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচনা বিষয়ে তার মত ছিল সাহিত্যরস পাঠকমনে সংক্রামিত করা; সাহিত্যের মূল ভিত্তি উদঘাটন এবং প্রকৃত সাহিত্যের আদর্শ-রূপ। উপস্থাপন – এই তিনই সমালোচনা-প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য সাহিত্য-রসস্নিগ্ধ প্রবন্ধ রচনা যা পাঠককে দেবে সাহিত্য-উপভোগজনিত আনন্দ।

বস্তুত পাঠক-মনকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিয়েই বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বর্তমান রুশ সাহিত্য থেকে শুরু হয়েছিল তার এই কাজ। এক্ষেত্রে তাকে বলা যায় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য ধারারই অনুসারী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন বাঙালির মন আর সাহিত্যরুচিকে উন্নত করার স্বেচ্ছা-নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রেও একই কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। তার সাহিত্য সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধের উৎস পাঠক-মননের বিকাশের কামনা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রাবন্ধিক সত্তা বিকাশের অন্যতম কারণ ‘প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯) আর কবিতা' (১৯৩৫ ১৯৬১) পত্রিকা দুটির সম্পাদনা। ১৯৪০ সালের ১২ মার্চ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ। কবিতা'-য় মুদ্রিত বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা-প্রবন্ধের প্রশংসা করেছেন। চিঠিটির কিছু অংশ উদ্ধত হল – “কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণত বাংলা কাগজে সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয় – তোমার লেখার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না।” ১৩৫২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা ‘কবিতা’-চিঠিটি

ছাপা হয়েছিল। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ মূল্যায়ন হিসেবে এ মন্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আধুনিক কবি এবং কবিতা সম্পর্কে সমকালের বিরূপ মানসিকতার অবসান ঘটানোর সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ দুই পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

তিনি জীবনানন্দের কবিতা মুদ্রণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি এই 'নির্জনতমা' কবিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্বন্ধে আলোচনার শেষে তার মন্তব্য প্রসঙ্গত মনে করা যায়

"....জীবনানন্দ দাশকে আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি। এবং 'ধুসর পাণ্ডুলিপি' তার প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে, আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝেই প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া দরকার।" (পৃ. ৩৩-৩৪, 'জীবনানন্দ দাশঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'কালের পুতুল', ১ম প্রকাশ ১৯৪৬, নিউ এজ সংস্করণ ১৯৫৯, নিউ এজ পাবলিশার্স)। আপন উপলব্ধিকে পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং এবিষয়ে ছিল তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস। তাই তিনি কেবল জীবনানন্দ নন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫) 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭) সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩০), বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি', অমিয় চক্রবর্তীর, 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৪০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' (১৯৪০) অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'নূতনা রাধা' (১৯৪২), সম্পর্কে 'কবিতা' পত্রিকায় লিখেছিলেন বহু প্রবন্ধ।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাতে বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিতে পারে এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার সক্রিয়তা অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বাংলা আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন একটি ইংরেজি প্রবন্ধ 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েট্রি' ('Modern Bengali Poetry' : 'An Acre of Green Grass' : ১৯৪৮) এবং একটি বাংলা প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি'

('শারদীয় দেশ', ১৯৬০) এবং নিজের সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' সংকলনের ভূমিকা-প্রবন্ধ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহের ভূমিকা আর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' একই ধরনের প্রবন্ধ। আধুনিক কবিতা ভিন্ন রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে।

বিশ শতকের প্রথম ভাগে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় মুখ্য ছিল দুটি দিক – মুগ্ধতা এবং বিদ্বেষ। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই দুই মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি আপন বোধের আলোয় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পৃথক তিনটি প্রবন্ধ-সংকলন রয়েছে তার – 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৫) 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) এবং 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬)। এছাড়া 'সাহিত্যচর্চা' (১৯৫৪) সংকলনের '২' পর্যায়ের তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে দুটি প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথ। 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের চারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রকবিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সংকলনের একটি প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ। প্রবন্ধগুলি প্রথমে লেখা হয় ইংরেজিতে। টেগোর : পোট্রেট অফ এ পোয়েট' : (১৯৬২, 'Tagore : Portrait of A Poet') সংকলনে স্থান পেয়েছে সেইসব প্রবন্ধ।

বাংলা প্রবন্ধগুলিতে অবশ্য আছে অনেক মার্জনা। এ সংকলনের 'কবিতার সাত সিঁড়ি' 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ' 'এপার ওপার' — এই চার প্রবন্ধের প্রথমটিতে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্থান, ও দান সম্পর্কে আছে বিশদ আলোচনা। বাকি তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বিবর্তন সম্পর্কে অনুভব-স্পন্দিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' সংকলনে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভিত্তিক কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর সংবেদন-স্পন্দিত আলোচনা।

'বাংলা ছন্দ', 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ', 'মানসী', 'রবীন্দ্রনাথের গানে গদ্য ও পদ্য' - এই তিন প্রবন্ধে বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করেছেন

বুদ্ধদেব। বিষয়টি আপন অনুভবের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছেন প্রাবন্ধিক। এখানেই তার চিন্তনের নিজস্বতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু সর্বদা নিজস্ব অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের আলোচনায় তিনি তেমন স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। তার মতে কবি-স্বভাবের সঙ্গে কথাসাহিত্যিকের সঠিক অন্বয় হয়নি রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে। পরিণামে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-কথা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা সর্বতোভাবে সফল হয়নি। তিনি ‘গোরা' (১৯০৯), ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) এবং ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯) ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসকে ত্রুটিযুক্ত সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৯) যে বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তি-মানসের জটিল দ্বন্দ্বকে শিল্পরূপ দানের সার্থক অগ্রদূত এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের আলোচনায় তিনি অপেক্ষাকৃত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে ঐক প্রতীতি নির্মাণে আর সাংকেতিক উপস্থাপনে বাংলা ছোটো গল্পকে করে তুলেছিলেন শিল্পসফল তা বুদ্ধদেবের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে বাস্তব ও মানব-প্রবৃত্তির সংঘাত চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তা বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

বুদ্ধদেব বসু মাইকেল মধুসূদন, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রাজশেখর বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী- এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কয়েকটি প্রবন্ধে। তা ছাড়া, শিশুসাহিত্য রামায়ণ আর মহাভারত সম্পর্কেও তিনি রচনা করেছেন কয়েকটি প্রবন্ধ। নিজের বোধ আর বোধির উদ্ভাস, ভাষার আকর্ষণী শক্তি, সর্বোপরি সুখপাঠ্যতা তার এইসব প্রবন্ধের বিশেষ গুণ। বিশেষ করে ‘মহাভারতের কথা’ (১৯৭৪)-য় আধুনিক দৃষ্টিতে মহাকাব্য এবং তার চরিত্রসমূহের মনোভাব বিশ্লেষণের যে দৃষ্টান্ত এ গ্রন্থে আছে তা একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মনন এবং বোধগভীরতার পরিচায়ক। ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটিতেও লক্ষিত হয় আধুনিক মানদণ্ডে মহাকাব্য বিচারের প্রবণতা। বলা বাহুল্য এ প্রবন্ধেও অনুভবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব। সে অনুবাদের ভূমিকা-প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব আধুনিক দৃষ্টিতে 'মেঘদূতম'-এর বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রতীচ্যের কবি শার্ল বোদলেয়ার (Charles Piaree Baudelaire : ১৮২১-১৮৬৭) রাইনার মারিয়া ব্রিলকে (Rainer Maria Rilke । ১৮৭৫-১৯২৬) ফ্রিডরিশ হোল্ডারলিন (Friedrich Johann Christian Holderin : ১৭৭১-১৮৪৩) এই তিনজনের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সেই অনুবাদ তিনটির ভূমিকায় এঁদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আপন মত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রবন্ধের আকারে।

বুদ্ধদেব সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অনুরাগী তাঁকে বলা যায় না। তাই এ বিষয়ে তার প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' ভিন্ন 'দময়ন্তী' কবিতা সংকলনের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) কবিতার ভাষা আর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনাভিত্তিক একটি প্রবন্ধ ছিল, যা পরে বর্জিত হয়।

তবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক – এ নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন। 'কিসের জন্য আর্ট' 'শিল্পীয় স্বাধীনতা' আর 'লেখার ইস্কুল' এরকম তিনটি প্রবন্ধ। শেষ প্রবন্ধটিতে অবশ্য লেখকের মানসপ্রস্তুতিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন কয়েকটি ভ্রমণ-বিবরণ। নিছক স্থান-কালের বিবৃতি বলা যাবে না সেগুলিকে। সব ভ্রমণ-কথাই তার অনুভবের দুতিতে হয়ে উঠেছে অসামান্য আকর্ষক নিবন্ধ।

ব্যক্তিগত নিবন্ধের সফল রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন বেশ কিছু রম্য নিবন্ধ। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫) এবং 'উত্তরতিরিশ' (১৯৪৫) তার এরূপ রচনার দুটি সংকলন। বুদ্ধদেব বসুর রম্য নিবন্ধের প্রধান বিশেষত্ব উদ্দেশ্যহীনতা। নিছক আত্ম-অনুভবের হৃদয়বেদ্য ভাষারূপ হিসেবেই গ্রন্থ দুটির অন্তর্গত নিবন্ধগুলি মূল্যবান।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বুদ্ধদেব বসু বাংলা প্রবন্ধধারার অন্যতম সার্থক প্রাবন্ধিক। নিজের উপলব্ধি সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে তার প্রবন্ধে। যুক্তি দিয়ে, তথ্য

সংগ্রহ করে তিনি সেই উপলব্ধিকে দাঁড় করিয়েছেন প্রবন্ধের দৃঢ় ভিত্তিতে। আবার একই সঙ্গে পাঠক-মানসে সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন সে উপলব্ধি। আমরা বলতেই পারি যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনি পাঠক-রুচি গঠনে এবং আপন অভিপ্রায়ের। প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সামগ্রিকভাবে বাঙালি ও বাংলার মনন-সাধনার উন্নয়নের প্রয়াসী ছিলেন। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র কবিতা বিশেষত আধুনিক কবিতার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠাভূমি এবং কবিতার রসগ্রাহী পাঠক-গোষ্ঠী গঠনের দিকে মন দিয়েছিলেন এবং তার সে প্রয়াস সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

১০.৯ অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন

বুদ্ধদেব বসুর 'রামায়ণ' প্রবন্ধের অনুসরণে বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২। 'রামায়ণ'-এ রাম চরিত্র সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নের যথার্থতা বিচার করুন।

৩। 'রামায়ণ' প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্ত মহাকাব্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নের যথার্থতা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ

করুন।

৪। বুদ্ধদেব বসুর বাংলা শিশুসাহিত্য প্রবন্ধ অবলম্বনে বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি

সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। 'বাংলা শিশুসাহিত্য' অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করুন।

মন্তব্য

৬। বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটির বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৭। রামায়ণ সম্পর্কে ব্যক্ত বুদ্ধদেব বসুর মনোভঙ্গি উক্ত প্রবন্ধ অনুসরণে বিশ্লেষণ করুন।

৮। বুদ্ধদেব বসুর অনুসরনে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৯। ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ অনুসরণে বাংলা কবিতা-জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করুন।

১০। বাংলা শিশুসাহিত্য অনুসরণে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করুন।

১১। ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

১২। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন

১। ‘বাংলা শিশু সাহিত্য’-এ বুদ্ধদেব বসু বাংলা শিশু সাহিত্যকে প্রধানত কয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন? বুদ্ধদেব

বসুর অনুসরণে যে কোনো একটি ভাগের বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখ্য লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত শিশুসাহিত্যের উল্লেখ্য গ্রন্থগুলির নামসহ তার রচনা-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

৩। বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে শিশুদের পড়তে শেখানোর বই হিসেবে ‘হাসিখুশি’ ও ‘সহজপাঠ'-এর তুলনাত্মক

আলোচনা করুন।

৪। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কৃত্তিবাস ওঝা আর রাজশেখর বসু - এই তিন জনের রামায়ণ অনুবাদ

বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক প্রবন্ধের অনুসরণে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য-বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। বুদ্ধদেব বসুর রচিত “রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা-স্বাতন্ত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৭। বাংলা শিশুসাহিত্যে – বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবন্ধ অবলম্বনে সুকুমার রায়, সুখলতা রাও ও লীলা মজুমদারের কিশোর সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৮। ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু রাম চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করেছেন তার যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৯। 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রামায়ণের অসংগতিসমূহ বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে বিশ্লেষণ করুন।

১০। যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে কেন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে অনন্য বলে মনে করেছেন বুদ্ধদেব বসু? ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন।

১১। ‘বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধ অনুসরণে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ন করুন।

১২। বাংলা শিশুসাহিত্য প্রবন্ধ অনুসরণে শিশুসাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব নির্ণয় করুন।

১৩। ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু কোন কবিকে রবীন্দ্র-উত্তর যুগের অগ্রপথিক বলে মনে করেছেন? উক্ত কবির বিশেষসমুহ বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন। বাংলা কবিতায় এর প্রভাব কীভাবে কাজ করেছিল?

১৪। ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধের অনুসরণে ‘স্বভাবকবি'র বিশেষত্বগুলি ব্যাখ্যা করুন। কেন রবীন্দ্র অনুসারী কবিগণকে বুদ্ধদেব বসু স্বভাবকবি বলেছেন?

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ সুদক্ষিণা বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭

দাস প্রভাতকুমার কবিতা পত্রিকা সূচিগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু আমাদের কবিতাভবন, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১

বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসু আমার যৌবন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৯

বসু সুদীপ বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

একক: ১১ - 'সাহিত্যচচা' : গঠনশৈলী ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাঃ টীকা, গ্রন্থপঞ্জি

বিন্যাসক্রম

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ সাহিত্যচর্চা: বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের-গঠন বৈশিষ্ট্য বিচার

১১.৩ বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব বিচার : 'সাহিত্যচর্চা'

১১.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

যে কোনো সাহিত্য-সংরূপের নিবিড় পাঠের অপরিহার্য অংশ আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ। লেখকের রচনা সম্পর্কে বিশদভাবে জানার পরেই আসে কেমন করে বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে সেই সংক্রান্ত আলোচনার সময়। এ আলোচনার ফলে লেখকের সাহিত্য-সৃষ্টি শক্তি এবং ভাষার উপর দখল সম্পর্কে জানা যায়। তার ফলে সাহিত্যের সেই বিশেষ সংরূপটির রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

এই সব কারণে বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচচা' প্রবন্ধ-সংকলনের পাঠ্য প্রবন্ধগুলির সামগ্রিক আলোচনার পরে এই এককটিতে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের গঠনশৈলী এবং ভাষা ব্যবহার বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ গঠনের বিশেষত্ব এবং প্রবন্ধ-ভাষা সম্পর্কে জানা যাবে সকল আবশ্যকীয় তথ্য। পাঠ্য প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত কয়েকজন সাহিত্যিক এবং

পত্রিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হয়েছে এই এককটিতে। কারণ পাঠ সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে নেওয়া শিক্ষার্থীর কর্তব্য। সে কর্তব্যে সহায়তার উদ্দেশ্যেই এ অংশের সংযোজন।

শিক্ষার্থীর পাঠ অনুশীলনের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে অন্যান্য এককের মতোই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসব প্রশ্নের অতিরিক্ত প্রশ্ন হওয়া সম্ভব। এবং সে জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রদত্ত প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র অনুশীলনের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত হয়েছে।

১১.২ সাহিত্যচর্চা: বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের-গঠন বৈশিষ্ট্য বিচার

বুদ্ধদেব বসু স্বভাবত ছিলেন কবি এবং সাহিত্য-প্রেমিক। মজ্জাগত সাহিত্যপ্রীতি আর কবি-স্বভাব দুয়ের মিলনে গড়ে উঠেছে তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তা। প্রকৃত সাহিত্য-মানস্কতা কেবল সাহিত্য-উপভোগেই সীমিত থাকে না। এই মানসিকতা সাহিত্য-আসক্তির কারণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়। সাহিত্যের আলোচনা এভাবেই শুরু হয়। নিজের ভালোলাগার প্রকৃতি ব্যাখ্যা এবং পাঠকে, সে ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ও সাহিত্য আলোচনামূলক প্রবন্ধের কাজ। 'সাহিত্যচর্চা' সংকলনে মূলত স্থান পেয়েছে সাহিত্য আলোচনা সংক্রান্ত প্রবন্ধ। স্বভাবত সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সংক্রান্ত আলোচনা প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তৃপ্ত হত তার মন। সে জন্যই এরূপ প্রবন্ধ বুদ্ধদেবের লেখনীতে লাভ করেছে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা।

বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ রচনার প্রচলিত রীতি মেনে চলেননি। অথাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করে যুক্তি-তথ্যের বিশ্লেষণ-মুখ্য শৃঙ্খলা-সংযুক্ত উপস্থাপন তাঁর প্রবন্ধে প্রাধান্য পায়নি। সর্বদা তাঁর প্রবন্ধে বড়ো হয়ে উঠেছে নিজস্ব অনুভব। সেই একান্ত অন্তরঙ্গ অনুভূতিটিকে তথ্য আর যুক্তির যথাযথ ব্যবহারে ভাষা-রূপ দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। একারণে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে মন্ময়তা আর তন্ময়তার সুষম অন্বয় লক্ষিত হয়।

তন্ময়তা আর মন্ময়তার সম্মিলিত উপস্থাপন বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমূহের গঠন-কৌশলের ভিত্তি।

বিষয়নির্ভর প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নিজের বক্তব্যকে তথ্য দিয়ে যুক্তির সহায়তায় সুশৃঙ্খলভাবে ভাষাবন্ধ করেন। আর অনুভবকেন্দ্রিক প্রবন্ধের মূল বিন্দু প্রাবন্ধিকের বিশেষ একটি অনুভব। সেই অনুভব সূত্রে স্তরে স্তরে লেখকের ভাবনাগুলি কিছু পার্শ্বিক যুক্তি আর তথ্য সহায়তায় বিন্যস্ত হয়।

যখন প্রাবন্ধিকের অনুভব আর কোনো যুক্তিসিদ্ধ বিষয় একত্রিত হয় (যেমন সাহিত্য-ইতিহাসের বিশেষ কোনো পরিবর্তন লেখকের বোধে নতুন হয়ে দেখা দেয়) তখনই প্রবন্ধে মন্ময়তা আর তন্ময়তার মিলন ঘটে। কবি ও সাহিত্যমনস্ক বুদ্ধদেবের প্রায় সব প্রবন্ধেই দেখা যায় এই মিলনের ভাষারূপ। বস্তুত গঠন বিচারে প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করা যায় ১) বিষয়মুখ্য প্রবন্ধ ২) অনুভব নির্ভর প্রবন্ধ যাকে বলা হয় রম্য নিবন্ধ ৩) মিশ্র প্রবন্ধ- এ শ্রেণির প্রবন্ধে অনুভবের অন্তরঙ্গ প্রকাশের সঙ্গেই মিশে যায় বিষয়ের আলোচনা, যুক্তি, তথ্য সিদ্ধান্ত। এ ধরনের প্রবন্ধের গঠন ঈষৎ শিথিল হয়। নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না এই প্রবন্ধধারাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের পৃথক পৃথক গঠনশৈলী নির্মিত হয়ে থাকে এ ধরনের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। প্রাবন্ধিকের লক্ষ থাকে নিজস্ব অনুভূতিটি পাঠকবোধে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দিকে। এই সঞ্চারের ক্ষেত্রেই তিনি যুক্তি আর তথ্য সহায়ে ব্যাখ্যার পন্থা অবলম্বন করেন। সহজ আলাপের আন্তরিকতার সুর এ শ্রেণির প্রবন্ধে অনুভূত হয়। বুদ্ধদেব বসুর ‘সাহিত্যচর্চা’ সংকলনের প্রবন্ধসমূহের গঠনের ক্ষেত্রে এই বিশেষত্বগুলি বর্তমান। আটটি প্রবন্ধের কোনোটিতেই নির্দিষ্ট কোনো গঠনশৈলী অনুসৃত হয়নি। প্রাবন্ধিক নিজস্ব ধরনে প্রতিটি প্রবন্ধ গড়ে তুলেছেন। অভিপ্রায়ের প্রকাশের জন্য বুদ্ধদেব অবলম্বন করেছেন অভিনব সূচনা পদ্ধতি। সমাপ্তির ক্ষেত্রেও নেই কোনো স্থির নিয়ম।

উদাহরণস্বরূপ আমরা মনে করতে পারি ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটির কথা। প্রবন্ধটির মূল অবলম্বন বাল্মীকি রামায়ণের মূল্যায়ন। কিন্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু রামায়ণকে ঘিরে আপন অনুভবের ক্রমবিকাশের দিকটিকে রূপ দিয়েছেন। প্রবন্ধের

সূচনায় বুদ্ধদেব বসু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ'—রামায়ণের কিশোরোপযোগী এই সংস্করণটি তাঁর বালকমনে যে অনুভব জাগিয়েছিল তারই বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। অংশটিতে কথোপকথনের অন্তরঙ্গ সুর অনুভূত হয়। প্রবন্ধের পরের অংশে আছে বয়োপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিকের কৃত্তিবাস কৃত বাংলা রামায়ণ পাঠের স্মৃতি। এই সূত্রে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণ আর কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন। আদি মহাকাব্যের বিশেষত্বসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন বুদ্ধদেব এই সূত্রেই। এরপরে এসেছে বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন। সে মূল্যায়নে বোধ আর বোধির সম্মিলন লক্ষিত হয়। রাজশেখর বসুর কৃত বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে যে অনুভব জাগ্রত হয়েছে, যুক্তি আর তথ্যের সুমিত সংহত ব্যবহারে তাকে রূপ দিয়েছেন তিনি এ প্রবন্ধে। একই প্রসঙ্গে তিনি রাম চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন; রামায়ণের অসংগতি-সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন।

সব সময়ই প্রধান হয়েছে তাঁর অনুভবজাত সিদ্ধান্ত। তাই তিনি রামায়ণের উত্তরকান্ডের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন; অথচ বেশির ভাগ সাহিত্য-সমালোচক অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত ও মূল কাহিনির পক্ষে অনাবশ্যক মনে করেন। প্রবন্ধ শেষে তিনি রাম চরিত্র নির্মাণে বাল্মীকির শিল্পকৌশলের বিশ্লেষণ করেছেন সংহত কয়েকটি বাক্যে। সেই সঙ্গে শিল্প তথা সাহিত্য কেমনভাবে মানবচিত্তে রসোদ্রেক করে তা দু-এক কথায় স্বচ্ছ করে দিয়েছেন।

ছয় অধ্যায়ের প্রবন্ধটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রামায়ণ সম্পর্কে লেখক অনুভবের প্রকাশে কোনো রূপ শৈথিল্য লক্ষিত হয় না। অনুভবের তথ্যঋদ্ধ, যুক্তিসম্মত ভাষারূপ দানে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব যে সাধারণ নয় সে সত্য মেনে নিতেই হবে।

'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধের সূচনায়ও আছে কৈশোর স্মৃতির স্মরণ। তাঁর এই প্রবন্ধের সাতটি অধ্যায়ে বোধ আর বোধির; তন্ময়তা আর মন্ময়তার সম্মিলিত প্রকাশ লক্ষিত হয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রারম্ভ কাল আর বিকাশ-কাল – দুই সময়-পর্বের বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর বোধ-জাত সিদ্ধান্ত।

আবার শিশুসাহিত্যিক হিসেবে সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর রবীন্দ্রনাথের বিচারকালে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর বহু পাঠজনিত মননজাত সিদ্ধান্তসমূহ। সে সব সিদ্ধান্ত কিন্তু অনেক সময়ে অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি তাই লিখতে পারেন "এডওঅর্ড লিয়র-এর লিরিকগুচ্ছে ব্যক্তিদের পরাকাষ্ঠা।" (পৃ. ৪৬, বাংলা শিশুসাহিত্য', সাহিত্যচর্চা' : দেজ পাবলিশিং, ১৯৭৬) কারণ যন্ত্রযুগের ইউরোপ সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছিল। সমাজের সে স্পর্ধার প্রতিবাদ সাহিত্যের নানা বিভাগে দেখা পয়েছিল। লিয়র-এর লিমারিক-এর চরিত্রগুলির অদ্ভুত আচরণে নিজস্বতার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এইভাবেই যন্ত্রনির্ভর সমাজের মানবসত্তার একীকরণ মানসিকতার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ রূপ পেয়েছে। লুইস করল-এর অ্যালিস কাহিনিতেও একই প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছে। সুকুমার রায়ের কবিতায় অনুরূপ বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে করেছেন বুদ্ধদেব। তবে সুকুমার রায়ের মূল্যায়নে তিনি মননতীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তিনি যথার্থই লিখেছেন উদ্দেশ্যপ্রাণতার কারণে লিয়র-এর রচনা পদ্যমাত্র আর সুকুমার রায়ের কবিতায় আছে কবিত্ব। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনায় আর তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে তিনি ঐতিহাসিক সুলভ তথ্য আহরণে আর সাহিত্য-বাধশক্তি দিয়ে তথ্য সমূহের ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সফল হয়েছেন।

'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রথম চার অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু এই সাহিত্যের দুই যুগের বিশেষত্ব আর লক্ষণগুলির যথোচিত বিশ্লেষণ করেছেন। সে বিশ্লেষণের মধ্যে তথ্যকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার দিকটি যেমন স্থান পেয়েছে তেমনই আছে অনুভবের স্নিগ্ধ রূপায়ণ। দুই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনার বিশেষত্বের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যায় তত্ত্ব-তথ্য-যুক্তির সঙ্গে নিজস্বতার আশ্চর্য দ্যুতি অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু।

পঞ্চম আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি আলাদা করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর রবীন্দ্রনাথের রচিত শিশু-কিশোরসাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় অন্তরঙ্গ অনুভবের কোমলতা আর যুক্তি-তথ্যের সুষ্ঠু উপস্থাপন। অবনীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে তাঁর এ অভিমত যথার্থ- যে "... বাল্যবঙ্গের রত্নবণিক তিনি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে শিশুসাহিত্যের ফ্রেমের মধ্যে তাঁকে ধরানো যায় না।" (পৃ. ৫৭, তদেব)

অবনীন্দ্রনাথের কিশোরসাহিত্যের মূল্যায়নে তিনি যুক্তি-তথ্যের সঙ্গে অপরূপ কবিত্বময় তন্ময়তার সুর মিলিয়ে দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পড়তে শেখানো আর সবে-পড়া-শিখে-ওঠা শিশুদের জন্য লেখা বইয়ের মূল্যায়ন করেছে বুদ্ধদেব বসু সম দক্ষতায়। তিনি আলোচনা করেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' আর রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ'-এর।

সাধারণত এরূপ ইতিহাস-কেন্দ্রিক সাহিত্যবিশেষত্ব আলোচনামূলক প্রবন্ধে সময়ক্রমই অনুসৃত হয়। খুঁটিনাটি সকল তথ্যই সেখানে স্থান পায়।

বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত এই নির্দিষ্ট প্রবন্ধগঠন রীতি অনুসরণ করেননি। তাঁর অনুভূতি-লোকে সাড়া জাগিয়েছে যেসব কিশোর-সাহিত্যিক তাঁদের নিয়েই তার আলোচনা। তাই তিনি 'সন্দেশ' আর 'মৌচাক' এই দুই পত্রিকার মধ্যেই সীমিত রাখেন আপন আলোচনা। আর কোনো কিশোর-পত্রিকার উল্লেখ করেননি তিনি। অথচ এই সময়-বৃত্তের গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেখকই অনালোচিত থাকেন না তাঁর এই প্রবন্ধটিতে।

যাঁদের নিজস্বতা-দীপ্ত সাহিত্য বাংলা শিশুসাহিত্যকে করে তুলেছে বিশিষ্ট— সেই সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' বর্ণ শিক্ষার গ্রন্থ হিসেবে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে অনন্য – এ সত্যের প্রতিষ্ঠায় তিনি আপন সাহিত্যবোধের গভীরতার প্রমাণ দিয়েছেন।

বস্তুত তথ্য-যুক্তির যথোচিত ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর উপস্থাপনভঙ্গির মধ্যে অনুভব-গভীরতার স্পন্দন অনুভূত হয়। একারণেই তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে সাহিত্যগুণান্বিত সৃষ্টি।

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের গঠনে প্রাধান্য পেয়েছে বুদ্ধদেব বসুর অনুভব-উজ্জ্বল সাহিত্য দৃষ্টি। প্রায় নিজের কালের এই বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিগণ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি অপেক্ষা আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন বেশি। তাই বুদ্ধদেব তাদের বলেছেন 'স্বভাবকবি'। বাংলা ভাষায় 'স্বভাবকবি'র আখ্যা যাকে দেওয়া হয় সেই গোবিন্দচন্দ্র দাসকে নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ শুরু হয়েছে। তিনি সাল-তারিখ-প্রধান ইতিহাস রচনা করেননি। সেই সময়ের পরিবেশ আর কবিদের মনোবৃত্তি সম্পর্কেই তাঁর আলোচনা আবর্তিত হয়েছে বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-পূর্বকালীন অবস্থার ব্যাখ্যাকালে তিনি কেবল পুরোনো ধারার সাহিত্যের বাহক দাশরথি রায়, রামপ্রসাদ সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই বলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথা তাঁর মনে পড়ে না। রবীন্দ্র-পূর্ব আরও বহু কবি যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮) প্রমুখ কবিকে তিনি বিস্মৃত হন। সম্ভবত তার কারণ এই যে এসব কবির রচনা তাঁর হৃদয় আলোড়িত করেনি।

রবীন্দ্রনাথের তীব্র-উজ্জ্বল প্রতিভার দ্যুতি সমকালের কবিগণের স্বাতন্ত্র লুপ্ত করে দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে তিনি চার অধ্যায়ের এ প্রবন্ধের প্রথম দুটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রানুসারী কবি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর অনুভব। অনুভবের সঙ্গে তথ্যের যথাযথ সংযোগে যুগ-প্রবণতা ব্যাখ্যায় তিনি সফল হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক যুগ-প্রবণতার ঈষৎ উন্মেষের দিকটি উল্লেখ করা হয়নি এ প্রবন্ধে। তার ফলে কিন্তু প্রবন্ধের গঠনে শিথিলতা আসেনি। বরং মিতকায় দুটি অধ্যায়ে বুদ্ধদেব আপন বক্তব্যের বুদ্ধি ও হৃদয়স্পর্শী উপস্থাপনে সমর্থ।

আলোচ্য প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র-উত্তর কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রপথিকের ভূমিকাটি বিশ্লেষিত হয়েছে। তার সঙ্গে বুদ্ধ দেব সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিগোষ্ঠীর উত্থান সম্ভব হল।

রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের মধ্যে ছিল প্রায় না বুঝে রবীন্দ্র কবিতার ধরনটির অনুসরণ।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যকে সচেতনভাবে ব্যবহার করে হয়ে উঠেছেন স্ব-মহিমায় ভাস্বর, প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে আছে এই সত্যের স্বীকৃতি যে পূর্বসূরির সৃষ্টির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই উত্তরসূরির কবিতা-নির্মাণ শক্তি সফল হতে পারে। অনুকরণ নয় স্বীকরণই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির পথ এ সত্য সংক্ষেপে অথচ যুক্তি-তথ্য সহ আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

বস্তুত পাঠ্য তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে এ প্রবন্ধেই সূচনা, বিস্তৃতি, সমাপ্তি ভিত্তিক বিভাগ সবচেয়ে স্পষ্ট। এবং সংহতি সর্বাপেক্ষা অধিক। আন্তরিক অনুভবের সঙ্গে যুক্তি-তথ্যের সমন্বয়ের যথার্থতা এ প্রবন্ধের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু আপন বক্তব্যকে বেশ স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু তন্ময়তা আর মন্ময়তার মিশ্রণে, অনুভব আর মননের সুষম অন্বয়ে বাংলা প্রবন্ধের যে একটি ধারা গড়ে উঠেছিল এ প্রবন্ধটি তার অন্যতম সফল দৃষ্টান্ত। – এ সত্য অবশ্যস্বীকার্য।

বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমূহের মৌল লক্ষণ এই অনুভব আর চিন্তণক্ষমতার, হৃদয় আর মস্তিষ্কের সুষম অন্বয়। এ কারণেই তার প্রবন্ধ-সাহিত্য গতানুগতিকতার স্রোতে হারিয়ে যায়নি; স্ববৈশিষ্ট্যে তারা হয়ে উঠেছে ভাস্বর।

১১.৩ বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব বিচার : ‘সাহিত্যচর্চা’

সাহিত্য ভাষানির্ভর শিল্প। অথবা যে শিল্পের মাধ্যম ভাষা - তারই নাম সাহিত্য। মাধ্যম-ভিন্নতার কারণে শিল্প লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ — একথা বলেছিলেন আরিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিকস’ গ্রন্থে।

সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। কিন্তু রূপবন্ধের ভেদ অনুসারে সাহিত্যভাষার মধ্যেও লক্ষিত হয় প্রভেদ। কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা – মূলত অনুভবনির্ভর এইসব সাহিত্য-শাখার ভাষা আর মননির্ভর যুক্তি তথ্যমূলক প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে সাধারণভাবে কিছুটা অমিল থাকেই। কখনও কখনও কিন্তু এই মিলহীনতার দিকটি প্রায় মুছে যায়।

বুদ্ধদেব বসু কবিতা ভিন্ন লিখেছেন উপন্যাস, ছোটো গল্প, নাটক আর প্রবন্ধ। এইসব সাহিত্য-রূপবন্ধে ব্যবহৃত তাঁর গদ্য ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সমতা বর্তমান। কারণ তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কবি ও গদ্য সাহিত্যিক।

পাঠক-অনুভবকে পরিতৃপ্ত করেন কবি। প্রাবন্ধিক যুক্তি-তথ্য, ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠক-মননকে জাগিয়ে তোলেন। কবি যখন গদ্য লেখেন তখন যুক্তি-তথ্যের সঙ্গে মিশে যায় অনুভবের লাবণ্য। বুদ্ধদেবের সব ধরনের গদ্য সাহিত্যের ভাষায় আছে এই স্নিগ্ধ লাবণ্য। তার সঙ্গে আছে স্বচ্ছ, সাবলীলতা। তাঁর কাব্যসুরভিত গদ্যে পরিমিতি বোধের প্রকাশ লক্ষণীয়। বাক্যবন্ধে শব্দ, এবং অর্থের ভারসাম্য বজায় আছে তাঁর গদ্য ভাষায়। দেওয়া হল একটি উদাহরণ – "আদি কবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে।" (১৩ রামায়ণ', 'সাহিত্যচর্চা', ১ম প্রকাশ ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ দেজ পাবলিশিং, ১৯৭৬)।

বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করতেন লেখার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। "... ইচ্ছে করলেই লেখক হওয়া যায় না, লিখতে শিখতে হয়।" – বলেছেন তিনি 'লেখার ইস্কুল' প্রবন্ধে। (প, ১২. কালের পুতুল ১ম প্রকাশ, ১৯৪৬, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৫৯, নিউ এজ পাবলিশার্স) ভাষার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন সচেতনভাবেই। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি বুঝেছিলেন "... সমাস জিনিসটার বিপুল ক্ষমতা আবিষ্কার করে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম, এও বুঝেছিলাম কোন অল্প হেরফেরেই বাংলা বিশেষ থেকে নিটোল এক একটি বিশেষণ বেরিয়ে আসে।" (পৃ, ৯০, 'আমার ছেলেবেলা', বুদ্ধদেব বসু, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সনস, ১ম সংস্করণ ১৯৭৩)।

আবার যখন ১৯৩২-এ কলকাতায় এসে সাহিত্যকেই জীবিকা করেন তখন তাঁর মন আরও না। সচেতন—ভাষা-সচেতন –"কলকাতায় এসে নানা জেলার বুলি শুনছি আমি কুড়িয়ে পাচ্ছি অনেক নতুন মৌখিক শব্দ—আর এমনি করে কানে শুনে শুনে নানা জাতের বাংলা বই পড়ে পড়ে অনেক উনি ও স্বীকরণের মধ্য দিয়ে আমি গড়ে তুলছি সেই ভাষা অন্তত তার কাঠামো – আজও দীর্ঘকাল ধরে আমি যাতে কথা বলছি বই লিখছি।" (পৃ, ৬৪, "আমার যৌবন" এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস, ১৯৮৯)। লক্ষণীয় যে সাহিত্যভাষা আর মৌখিকভাষা —দুই ভাষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল একান্ত নিজস্ব তাঁর ভাষা—যা স্বচ্ছ এবং আকর্ষক।

শব্দ এবং বাক্যে তাদের ব্যবহার দিয়ে নির্মিত হয় ভাষার অবয়ব। প্রতিটি ভাষায় কতা ক্রিয়া কর্মের বিন্যাসক্রমের নিজস্ব নিয়ম আছে। বাংলা ভাষায় কতা, কর্ম ক্রিয়া—এই অধ্যয়টি সাধারণত লক্ষিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে বাক্য গঠনে তিনি ইংরেজি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যে দিন ফুটলো কমল' (১৯৩৩) উপন্যাসটি পড়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে তাঁর অভিমত –"পড়তে পড়তে খটকা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি।" (পৃ. ১২০, চিঠিপত্র ১৬শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২ ব.)। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সব বাঙালি লেখকের ভাষায় ইংরেজি ভাষার ধরনের পদান্বয় বা বাগবিধির প্রভাব লক্ষিত হয়। উদ্ধৃত পত্রাংশটির দুটি বাক্যেই কতা, কর্ম, ক্রিয়ার বিন্যাসক্রম পালটে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে বাংলা ভাষার মেজাজের সঙ্গে মিশে গেছে। বস্তুত বাংলার একতা কম ক্রিয়ার বিন্যাস রীতি বেশ নমনীয়। বুদ্ধদেব বসুও ইংরেজি রীতি প্রভাবিত বাক্য গঠনে বাঙালির মুখের ভাষার শব্দ আর বাগধারার প্রয়োগ করেছেন; এনেছেন অন্তরঙ্গ আলাপের সুর। ফলে তাঁর ভাষা হয়েছে আকর্ষক। তিনি ইংরেজি ভাষার পদান্বয় রীতিটিকে এভাবেই বাংলা ভাষার নিজস্ব ধরনের সঙ্গে সার্থকভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। একটি দৃষ্টান্ত – "বিরাট বিশ্বকে গুটিয়ে এনে এইটুকু কৌটোর মধ্যে ধরিয়ে দিয়েছেন।" (পৃ ৬৩ বাংলা শিশুসাহিত্য, সাহিত্যচচা', ১ম প্রকাশ, ১৯৫৪, দে'জ

পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৬)। এখানে করি প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই কর্ম এসেছে শেষে। কিন্তু চলিত শব্দ 'কৌটো' আর 'ধরিয়ে দেওয়া এই দেশজ বাগধারাকে ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করায় বাক্যটিতে বিদেশি প্রভাব লুপ্ত হয়েছে বললেই হয়।

আর একটি সুন্দর উদাহরণ – "যে রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা বর্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ হেলায় হারিয়েছে—সেগুলি কোনোরকম সুযোগ বলেই মনে হয়নি তাঁর।" (পৃ, ২৩, রামায়ণ, তদেব)।

চলিত শব্দ আর বাগধারার অজস্র উৎসার তাঁর ভাষার বিদেশি আদলটিকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। আরও মনে রাখতে হবে যে উপন্যাসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বাক্যে ইংরেজি প্রভাবের কথা লিখেছিলেন তা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ। সাহিত্যচর্চার প্রকাশকাল ১৯৫৪। দীর্ঘ এ ব্যবধানে তাঁর ভাষা আরও বেশি করে ইংরেজি প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে।

শব্দ-বিন্যাসের নিজস্বতা অনুভবকে স্বচ্ছ করে দেওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল বুদ্ধদেব বসুর। যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার ব্যাঙ্গ-তির্যক রম্যতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"সেই একই ঝাল মিষ্টি-মেশানো মুড়মুড়ে ঠাট্টা আবার তিনি ছড়িয়েছেন 'রাঙা ধানের খৈ'-তে," (পৃ. ৫৫, বাংলা শিশুসাহিত্য', দেশ) অন্নদাশঙ্করের ছড়ার প্রকৃতি সাবায়ব হয়ে উঠেছে এই বাক্যাংশটিতে।

তার ভাষা একান্ত বাঙালি মনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তৎসম শব্দে সচ্ছন্দ ব্যবহারে আর তৎসম-তদ্ভবের সাবলীল বিন্যাসে। দেওয়া হল দুটি উদাহরণ। প্রথমটি তৎসম-শব্দ ব্যবহারের উদাহরণ আর দ্বিতীয়টিতে তৎসম-তদ্ভব শব্দের মিশ্রিত সফল প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

১) "এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অবচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই।" (পৃ. ১২৬, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', তদেব)।

২) “এই লেখার রস গ্রহণের জন্য 'শিক্ষিত' হতে হয় না, ‘অভিজ্ঞ’ হতে হয় না; মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই গোছের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট।” (পৃ. ৫৯, বাংলা শিশুসাহিত্য, তদেব)।

তৎসম-তদ্ভবের সঙ্গে ‘গোঁয়ার’ ‘উজোড়’ ‘ছাঁচ', মুড়মুড়ে’ ‘আস্ত' 'মাচা', 'নড়তে’, ‘চাপড়ানো’ - প্রভৃতি। দেশজ শব্দের অবিরল প্রয়োগ তাঁর ভাষাকে করে তুলেছে একান্তভাবে বাঙালির প্রাণের ভাষা।

বক্তব্যকে স্বচ্ছতা দেওয়ার জন্য, বোধকে পরিস্ফুট করার জন্য সব রকমের শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এখানে তিরিশের দশকের আধুনিক কবিদের অন্যতম বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আর প্রবন্ধে শব্দ-ব্যবহার নীতি প্রায় এক হয়ে গেছে বলা যায়।

ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন শব্দ নির্মাণ করেছেন বিষয় অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী সতর্ক শিল্পী বুদ্ধদেব বসু। নানাভাবে তিনি আপন উদ্দেশ্য-সহায়ক শব্দ সৃষ্টি করেছেন।

প্রথমত বিশেষ্য-বিশেষণের সঙ্গে ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় যোগে তিনি তৈরি করেছেন বেশ কিছু শব্দ। যেমন ‘পরমতা', 'অবান্তরতা' ('রামায়ণ') ‘নিশ্ছবিতা’, ‘দৃশ্যতা’ (বাংলা শিশুসাহিত্য') ‘নিকুণ্ঠ’ (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক) ‘বৈশিকতা’ (বাংলা শিশুসাহিত্য')।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত শব্দের সাদৃশ্যে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে কিছু কিছু নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন তিনি। যেমন ‘অকুণ্ঠ’-র সাদৃশ্যে ‘বিকুণ্ঠ', কবিত্ব র সাদৃশ্যে ‘বাল্মীকিত্ব, স্বার্থান্বেষী-র সাদৃশ্যে ‘রামান্বেষী (রামায়ণ')।

তৃতীয়ত বুদ্ধদেব বসু একেবারে নতুন দু-একটি শব্দও তৈরি করেছেন - যথা নিরামিষ আহার অর্থে ‘অমাংস ভোজন' (রামায়ণ')।

চতুর্থত, জোড়কলম শব্দ – একটি শব্দের অংশের সঙ্গে অন্য শব্দের অংশ মিশিয়ে নতুন শব্দ নিমাণ করা ভাষার একটি সাধারণ বিশেষত্ব। বুদ্ধদেব বসু এ ধরনের কিছু শব্দ স্বয়ং নির্মাণ করেছেন। অধিকাংশ (১৩৮) ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি শব্দের সঙ্গে যোগ

করেছেন বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ। দেওয়া হল দু-একটি উদাহরণ। যেমন ‘রেডিওমুখর’, ‘সিনেমাচ্ছন্ন’, ‘লজিকনিষ্ঠ', (বাংলা শিশুসাহিত্য')। আবার অনেক সময় বাংলা ভাষায় তত দুটি শব্দ নিয়ে নির্মাণ করেছেন একটি শব্দ “অনুরচিত (অনুবাদ + রচিত) বিদেশি গল্পের অনুসরণে ক আখ্যান অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত ('বাংলা শিশুসাহিত্য') হয়েছে।

কয়েকটি বিদেশি শব্দের আক্ষরিক বা ভাবানুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব। যেমন ‘বিশেষীকরণ’ স্পেশালাইজেশন এর অনুবাদ ('রামায়ণ'); ‘পদ্মভুক” লোটাস-ইটার শব্দটির অনুবাদ ('রামায়ণ'); 'রোমাঞ্চিকা" অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি অর্থে ('বাংলা শিশুসাহিত্য) “পরাদৃষ্টি ‘ভিসন'-এর অনুবাদ (vision : বাংলা শিশু সাহিত্য') ‘লাইট' শব্দটির অনুবাদ হিসেবে তিনি ‘পাৎলা’ আর ‘হালকা’ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। নতুন সৃষ্টি নয় কিন্তু প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে অনন্য। যেমন - ‘পাৎলা করে ('লাইট বাংলা শিশুসাহিত্য) ‘হালকা কবিতা” (Light Verse; বাংলা শিশুসাহিত্য)।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব নতুনত্ব এনেছেন নানাভাবে যেমন ‘পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মোনভাব (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'), 'কালের করুণাময় সম্মার্জনী'

(রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক) ‘যাদের মনের এখনো দাঁত ওঠেনি' ('বাংলা শিশুসাহিত্য'), ‘অবসাদহীন প্রবাহ’ ('বাংলা শিশুসাহিত্য)।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষা (বলা ভালো তাঁর ভাষার) সাধারণ বিশেষত্ব ছেদচিহ্নের চিন্তনঋদ্ধ ব্যবহার।

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহারে ভাষার বাক্যগঠন, সবিরতি এবং ভাবস্পন্দ নির্দিষ্ট হয়। চিন্তারীতি এবং যুক্তির ক্রমপর্যায় বুঝিয়ে দেয় যতিপাত। তা ছাড়া বিবৃতির সম্পূর্ণতা জ্ঞাপনের জন্যও ব্যবহৃত হয় ছেদচিহ্ন।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় সাধারণভাবে কমা, সেমিকোলন ও ড্যাশ—এই তিন যতি চিহ্নের সতর্ক ব্যবহার। বর্তমান। প্রবন্ধভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় না তার ব্যতিক্রম। বুদ্ধদেব বসু একটি বাক্যের অংশ বাক্য বোঝাতে কমার বহুল ব্যবহার করেছেন। রাবণ বধান্তে সীতার রাম সমক্ষে আগমন বিবৃত করেছেন তিনি এমনই একটি কমা-বহুল বাক্যে -

"কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হলো, সাজতেও হলো, পালকি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে।" (পৃ. ১৭, রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা', ১ম প্রকাশ ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬)।

বুদ্ধদেব বসু সংযোজক অব্যয় হিসেবেই প্রধানত সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন। – "নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।" (পৃ, ১২৬, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, তদেব)।

ড্যাস চিহ্ন বুদ্ধদেব বসু ব্যবহার করেছে বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য—"নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলবো— এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হলো।" (পৃ. ১২৬, তদেব)।

সাধারণত ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবহমানতা পরিস্ফুট করার দিকে নজর ছিল বুদ্ধদেব বসুর। -

"অবনীন্দ্রনাথ, বাল্যবঙ্গের রত্নবণিক তিনি, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে শিশুসাহিতে ফ্রেমের মধ্যে তাঁকে ধরানো যায় না।" (পৃ. ৫৭ বাংলা শিশুসাহিত্য' তদেব) এখানে 'ধরানো যায় না ক্রিয়ানি পরবর্তী বাক্যের বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। এভাবেই বাক্যের পর বাক্যে বক্তব্যকে বিস্তৃত করে বুদ্ধদেব বস গড়ে তোলেন বোধ ও মননঋদ্ধ এক একটি অনুচ্ছেদ।

তার বাক্যের মধ্যে আলাপের অন্তরঙ্গ সুরই প্রবল—"বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্প : আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—এই হলো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হলেও তখন আমার চলতো, এমনকি রাবণকে না হলেও – কেন না, রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফুর্তিটা মাটি হলো তো সীতা রাবণের জন্যই।" (পৃ. ৯, রামায়ণ' তদেব)।

প্রশ্নোত্তরের ভাবটিও প্রায়শ তাঁর মার্জিত, বুদ্ধি ও অনুভবগ্রাহ্য বাচনভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণ— কেউ হয়তো বাঁকা ঠোটে বলবেন— আমাদের জাতিগত ছেলেমানুষি এখনো ঘোচেনি; কিন্তু আমি বলবো এই শৈশবসিদ্ধি শান্তশীল গৃহস্থ বাঙালির চিত্তবৃত্তির অন্যতম প্রকাশ।" (পৃ. ৭১, বাংলা শিশুসাহিত্য', তদেব)।

বুদ্ধদেব সংক্ষিপ্ত সরল বাক্য পছন্দ করেন না। তিনি জটিল বাক্য নির্মাণের পক্ষপাতী। ছোটো ছোটো অনেক বাক্য সমন্বয়ে গঠিত বাক্যমালার মাধ্যমে বক্তব্যের রূপ দানে তিনি অভ্যস্ত এবং সফল— "যেহেতু তার পরিবেশ ছিলো ভিন্ন এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না করে উলটে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েই শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।" (পৃ. ১২৫, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', তদেব)।

কয়েকটি ছোটো বাক্য সংযোজক অব্যয় "যেহেতু' আর কমা দিয়ে যুক্ত হয়েছে এই দীর্ঘ বাক্যটিতে। প্রবহমানতা সম্পন্ন এ বাক্যাবলি পাঠক-মননকে জাগ্রত করে।

একই সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো ক্রিয়াহীন মিতকায়, ঋজু, তৎসম শব্দ-নির্ভর বাক্যও ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু সম দক্ষতায়। যেমন 'রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত্র' পৃ.১৬, (রামায়ণ, তদেব)। বা "কিন্তু এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লীলা মজুমদার"। (পৃ. ৫৫, বাংলা শিশুসাহিত্য, তদেব)। কখনও কখনও কবিতা বা ছড়ার থেকে গড়ে ওঠে এই কবি-প্রাবন্ধিকের বাক্য- অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর এই বিশ্লেষণী বাক্যটি একই সঙ্গে অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশে সক্ষম এবং সুন্দর হয়ে উঠেছে লৌকিক ছড়ার "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর। তার মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর।" এই পঙক্তি দুটির আভাসিত ব্যবহারে : – "দুই যুগে ব্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার সেতুবন্ধী সওদাগর।" (পৃ. ৫৬, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', তদেব)। একই প্রবন্ধে এই লেখক সম্পর্কে তাঁর একটি বাক্যে যেন আভাস আছে রবীন্দ্রনাথের গানের এই পঙক্তির 'একলা বসি ঘরের কোণে/ কী যে

ভাবি আপন মনে'- "সমসাময়িক পরিবেশের মধ্যে তিনি যেন থেকেও নেই; তিনি লিখেছেন একলা বসে আপন মনে ঘরের কোণে, লিখেছেন যে রকম করে না-লিখেই তিনি পারেননি; ভাবেননি সে লেখা কার জন্য, কে পড়বে; কিংবা যদি-বা ছোটোদের কথা ভেবে থাকেন সেই ছোটোরাও বিশ্বমানবের প্রতীক।" (পৃ. ৫৭, তদেব)

অভিপ্রায়ের প্রাণময় রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষাকে করে তুলেছে অনন্য। বাংলা শিশুসাহিত্য প্রবন্ধে লীলা মজুমদার সম্বন্ধে তিনি ব্যবহার করেছেন এমনই কিছু বাক্য। একটি উদ্ধৃত হল – "এই কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা এমন সুমিত হয়ে মিশেছে, এমনভাবে আজগবির সঙ্গে বাস্তবের মাত্রা ঠিক রেখে। আর এমন নিচু গলার লয়দার গদ্যের বাহনে, যে লীলা মজুমদারকে তার পরিমাণের মন-খারাপ করা ক্ষীণতা সত্ত্বেও বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি আসন দিতে হয়।" (পৃ, ৫৬, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', তদেব)।

অলংকারের স্বতোৎসার ব্যবহার আছে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধভাষায়—"এর ফলে সর্বাঙ্গে সার্থক হয়েছে 'সহজ পাঠ'—বাংলা ভাষার রত্ন স্বরূপ এই গ্রন্থ, যেন প্রতিভার বেলাভূমিতে উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নিটোল স্বচ্ছ একটি মুক্তো।" (পৃ. ৫৮, তদেব)। উপমা অলংকারের নিপুণ এই ব্যবহারে 'সহজ পাঠ'—এর অসামান্যতা এমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে পাঠকমন সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে।

প্রবন্ধ-ভাষায়ও মধ্যে মধ্যে চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধ দেব। চিত্রকল্প তাকেই বলা হয় যখন শব্দ-নির্মিত চিত্রে সঞ্চারিত হবে ইন্দ্রিয়ানুভব এবং সে অনুভব মনে জাগাবে আবেগের স্পন্দন, তখনই শব্দচিত্র হয়ে ওঠে চিত্রকল্প। চিত্তে ভাব-স্পন্দন সঞ্চার করে দেওয়াতেই চিত্রকল্পের সার্থকতা। সিসিল, ডে, লুইস (Cecil Day Lewis) তাঁর 'দ্য পোয়েটিক ইমেজ' ('The Poetic Image') গ্রন্থে লিখেছেন চিত্রকল্প '... a word picture charged with emotion or passion', অনুভবের এই সংরক্ত প্রকাশ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পে। দেওয়া হল একটি দৃষ্টান্ত। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টির বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছে—"আকাশের উঁচু পাড় থেকে যে-বাজ অমোঘ হয়ে নেমে আসে তাকেও এ

নমস্কার জানায়, আবার পায়রার রক্তমাখা ছেড়া পালকটিকেও করুণা দিয়ে ধুয়ে দেয়।" (পৃ. ৬৩, বাংলা শিশুসাহিত্য', তদেব)। এই দুটি চিত্রে যেমন আছে চক্ষু ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভব তেমনই সে অনুভব মনে জাগায় বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য হিংসা আর তার শিকার—উভয়েরই অনিবার্যতার স্বীকৃতি! তা ছাড়া মনে শিকারির শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা আর শিকারের লক্ষ্য প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে অমোঘ এ নিয়মকে মেনে নেওয়ার মতো মহৎ আবেগের স্পন্দন জাগায় বলেই এই শব্দচিত্র হয়ে উঠেছে সফল চিত্রকল্প।

অনুভব রূপায়ণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বুদ্ধদেব বসু। এ জন্যই কয়েকটি শব্দের প্রচলিত বানানের অনুসরণ করেননি তিনি। হল, ছিল—বলল—এসব শব্দের ক্ষেত্রে তিনি ও ব্যবহার করেন, সম্ভবত শব্দ-ব্যঞ্জিত ঘটনার দিকটিকে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্যই। হিসেব, জিনিস এসব শব্দে 'স' স্থানে শ' ব্যবহার করেন তিনি। একান্ত নিজস্ব তাঁর এসব বানান বুদ্ধদেবের গদ্য ভাষার বিশেষত্ব বলেই গৃহীত হয়ে থাকে।

এ আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে এই সত্য যে আবেগ আর প্রজ্ঞার সম্মিলনে গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর গদ্য ভাষা। তার সঙ্গে আছে বক্তব্যকে মূর্ত করে তোলার মতো ভাষা নির্মাণের ক্ষমতা। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের আকর্ষক পাঠরম্যতার অন্যতম কারণ তাঁর ভাষা ব্যবহার। ভাষা ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতা ছিল বুদ্ধদেব বসুর। তাঁর প্রবন্ধ-ভাষার মধ্যে লক্ষিত হয় তারই প্রমাণ – এ কথা বলতেই হয়।

১১.৪ গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ সুদক্ষিণা বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭

দাস প্রভাতকুমার কবিতা পত্রিকা সূচিগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু আমাদের কবিতাভবন, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১

বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসু আমার যৌবন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৯

বসু সুদীপ বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

একক ১২ - সাহিত্যচর্চা: প্রবন্ধ সম্পর্কিত টীকা: 'বাংলা শিশুসাহিত্য'

বিন্যাসক্রম

১২.১ এডওয়ার্ড লিয়র (Edward Lear: ১৮২২-১৮৮৮)

১২.২ কিথ গিলবার্ট চেস্টারটন (Keith Gilbert Chesterton : ১৮৭৪–১৯৩৬)

১২.৩ কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ - ১৯৫০)

১২.৪ ক্রিস্টোফার মার্ল (Christopher Marlow : ১৫৬৪ – ১৫৯৩)

১২.৫ গ্রিম ভাই : জ্যকোব গ্রিম (Jakob Grimn : ১৭৮৫ - ১৮৬৩), উইলহেলম গ্রিম (Wilhelm Grimn : ১৭৮৬ – ১৮৫৯)

১২.৬ জিওফ্রে চসার (Geoffrey: Chaucer : ১৩৪৫ – ১৪০০)

১২.৭ জেমস জয়েস (James Joyce: ১৮৮২ - ১৯৪১)

১২.৮ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (স্যার: ১৮৬০ — ১৯৩০)

১২.৯ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩ – ১৯৩৮)

১২.১০ ‘মৌচাক’

১২.১১ যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ – ১৯৩৭)

১২.১২ রবার্ট লুই বালফুর স্টিভেনসন (Robert Louis Balfour Stevenson; ১৮৫০ – ১৮৯৪)

১২.১৩ রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪ - ১৯৬৯)

১২.১৪ লুইস ক্যারল (Lewis Carroll; Charles Lutwidge Dodgson-এর ছদ্মনাম : ১৮৫০-১৮৯৪)

১২.১৫ শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৭ – ১৯৮০)

১২.১৬ সুখলতা রাও (১৮৮৬ – ১৯৬৯)

১২.১৭ সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯২ - ১৯৬৮)

১২.১৮ হারবার্ট জর্জ ওয়েলস (Herbert George Wells : ১৮৬৬ – ১৯৪৬)

১২.১৯ হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসন (Hans Christian Anderson : ১৮০৫ - ১৮৭৫)

১২.২০ ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’

১২.২১ অনুশীলনী

১২.২২ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ এডওয়ার্ড লিয়র (Edward Lear: ১৮২২-১৮৮৮)

এই ইংরেজ চিত্রকর ও কৌতুককবিতা রচয়িতার জন্মস্থান লন্ডন। ভালো ছবি আঁকতেন। লিখেছেন নিজের আঁকা ছবি সমেত কয়েকটি ভ্রমণকথা ‘স্কেচেজ অফ রোম’ ('Sketches of Rome' : ১৮৪২), ‘ইলাস্ট্রেটেড এক্সকারসনস ইন ইটালি’ (Illustrated Excursions in Italy' ১৮৪৬)।

পৃষ্ঠপোষক ডার্বি (Derby) র ত্রয়োদশ আর্ল-এর নাতিদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি রচনা করেন ননসেন্স লিমেরিক’ বা আপাত অর্থহীন কৌতুককবিতা। তাঁর আঁকা রেখাচিত্র সহ এসব কবিতার সংকলন মুদ্রণের পর তাঁকে এনে দেয় বিশ্বখ্যাতি। সেইসব সংকলনের নাম এ বুক অফ ননসেন্স' ('A Book of Nonsense' : ১৮৪৬), ননসেন্স সংস, স্টোরিজ, বোটানি অ্যান্ড অ্যালফাবেটস' ('Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets' : ১৮৭০), ‘মোর ননসেন্স রাইমস্ ('More Nonsense Rhymes': ১৮৭১), লাফেবেল লিরিকস ('Laughable Lyrics' : ১৮৭৬)।

১২.২ কিথ গিলবার্ট চেস্টারটন (Keith Gilbert Chesterton : ১৮৭৪–১৯৩৬)

লন্ডন শহরে জন্ম। এই ইংরেজ কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও গল্পকার শিল্পী হবার পাঠ নিলেও লেখাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। নিজের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘জি’কেস উইকলি' ('G.K' Weali, ১৯২৫)- তে তাঁর বেশির ভাগ লেখা মুদ্রিত হত। যাজক-গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন-এর স্রষ্টা চেস্টারটন বেশ কয়েকটি জীবনীও লিখেছে। উল্লেখ্য গ্রন্থ ‘দ্য নেপোলিয়ন অফ নটিং হিল' ('The Napoleon of Notting w . ১৯০৪), দি ইনোসেন্স অফ ফাদার ব্রাউন’ ('The Innocence of Father Brown' : ১৯১৯),

‘সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অসিসি’ ('St. Francis of Assisi' : ১৯২৩), কলেক্টেড পোয়েমস’ (collected Poems' : ১৯৩৩) প্রভৃতি।

১২.৩ কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮ - ১৯৫০)

পিতা কালীনাথ রায়চৌধুরী। ময়মনসিংহের মসুয়ার প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান কুলদারঞ্জন ছিলেন আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ক্রিকেট, হকি খেলায় দক্ষ শিশুসাহিত্যিক। ১৯১৩ সালে সন্দেশ’-এ মদিত হয় তাঁর প্রথম লেখা। পুরাণকথা ও বিদেশি ধ্রুপদি সাহিত্যের কিশোর-উপযোগী অনুবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য, গ্রন্থ ‘রবীন হুড’ (১৯১৪), ‘ওডিসিয়ুস’ (১৯১৫) ছেলেদের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৯১৭) ‘বাস্কারভিল কুকুর’, ‘আশ্চর্য দ্বীপ' প্রভৃতি।

১২.৪ ক্রিস্টোফার মার্ল (Christopher Marlow : ১৫৬৪ – ১৫৯৩)

সাধারণ পরিবারের সন্তান এই ইংরেজ নাট্যকার পড়াশোনা করেন কিংস স্কুল ও কেমব্রিজ-এর বেনেট (Benet) কলেজ-এ। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে পানশালায় দাঙ্গার ফলে শৃঙ্খলাহীন জীবনে অভ্যস্ত ট্র্যাজেডি রচনায় শেকসপিয়র-এর পথ-প্রদর্শক এই লেখকের মৃত্যু হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র ও বলিষ্ঠ প্রয়োগে । তিনি কিছু কাব্য ও নাটক রচনা করেন। নব জাগরণ যুগের মানব মহিমার দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায় তার নাটকে। তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত নাটক ‘দ্য ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ড. ফাউস্টাস’ ('The Tragical History of Dr. Foustus': রচনাকাল ১৫৮৮; মুদ্রণকাল; ১৬০৪)। আর একটি নাটক ‘দ্য জু অফ মাল্টা’ ('The Jew of Malta' রচনাকাল ১৫৮৯ : মুদ্রণসময় ১৬৩৩)। অসমাপ্ত কবিতা ‘হিরো অ্যান্ড লেন্ডার’ ('Hero and Lender' : মরণোত্তর প্রকাশ ১৫৯৮)। কিছু ধ্রুপদি সাহিত্যের অনুবাদও তিনি করেছেন।

১২.৫ গ্রিম ভাই : জ্যকোব গ্রিম (Jakob Grimn : ১৭৮৫ - ১৮৬৩), উইলহেলম গ্রিম (Wilhelm Grimn : ১৭৮৬ – ১৮৫৯)

এই দুই ভাই পড়াশোনা করেন মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কাজ করতেন ভেস্টফালিয়া রাজের গ্রন্থাগারে। এঁদের অনন্য কীর্তি জার্মানির রূপকথা ও লোককথার সংকলন 'শৈশব এবং গার্হস্থ্য রূপকথা' (Kinder and Hansmarchen' : ১৮১২ - ১৮১৫)। এঁদের যৌথ রচনার মধ্যে আছে জার্মানির পুরাবৃত্ত ('Deutsche Sagen' : ১ ;খণ্ড ২ - ১৮১৬ – ১৮১৮ ,(জার্মান শব্দ কোষ' (১৮৫২ এবং জার্ম (১৮৬০ -ান পুরাণে উল্লিখিত অরণ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানভিত্তিক সাময়িকী 'আদি জার্মানির অরণ্যানী' ('Altdent scha Walden' : ১৮৩৩ - ১৮১৬) সম্পাদনা।

জ্যাকোব-এর একক রচনা জার্মান ভাষার ব্যাকরণ (১৮১৯-১৮৩৭) ও জার্মান পুরাবৃত্ত'। উইলহেলম এর একক রচনা - জর্মন বীরগাথার' ও 'োলান্ড-এর গান' (১৮৩৮)।

১২.৬ জিওফ্রে চসার (Geoffrey: Chaucer : ১৩৪৫ – ১৪০০)

মধ্য যুগের সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন ইংরেজ কবি চসার ছিলেন নব জাগরণ যুগের প্রথম পর্বের কবি। নানাবিধ সরকারি কাজ করেছেন তিনি; যুক্ত ছিলেন বহু অভিজাত ও রাজ পরিবারের সঙ্গে। নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর জীবন। নানা রীতিতে বিভিন্ন ধরনের কাব্য ও কবিতা রচনা করেছে এই কবি। তাঁর প্রথম পরিণত কবিতা সংকলন 'দ্য বুক অব দ্য ডাচেস' ('The Book of the Duchess' : ১৩৬৯—১৩৭০) তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা' ('Troilus and Criseyde') আনুমানিক ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা কবিতা ও গদ্যে

মিশ্রিত আখ্যানমালা ক্যান্টারবেরি টেলস্ ('Canterbury Tales') অসমাপ্ত এই কৌতুকসিক্ত কাহিনিমালায় পাওয়া যায় মধ্যকালীন ইউরোপীয় জীবনের সামগ্রিক রূপচিত্র।

১২.৭ জেমস জয়েস (James Joyce: ১৮৮২ - ১৯৪১)

চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস, ফ্রয়েডীয় যৌন প্রবণতার প্রকাশরূপ সমন্বিত উপন্যাস-রচয়িতা আইরিশ সাহিত্যিক। জয়েস ভাষাগত নানা পরীক্ষা করেছে তাঁর উপন্যাসে – নির্মাণ করেছে ব্যঞ্জনাময় নানা শব্দ।

তিনি বেশ কিছু গল্পও লিখেছে। প্রথম গ্রন্থ ডাবলিনার্স (Dubliners : ১৯১৪) নামের গল্প সংকলন। 'দ্য পোট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান' ('The Portrait of the Artist as a Youngman' : ১৯১৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস। তাঁর প্রধান উপন্যাস 'ইউলিসিস' (Ulysses' : ১৯২২) উপন্যাসের কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে এনেছিল যুগান্তর।

তাঁর শেষ উপন্যাস ফিনিগানস ওয়েক' (Funigans Wake' : ১৯৯৩) চেতনাপ্রবাহ রীতির সঙ্গে ভাষা সংক্রান্ত পরীক্ষার মিশ্রণে হয়ে উঠেছে জটিল। তথাপি এ উপন্যাসে লেখকের রচনা-দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না।'

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে মীরার স্বামী। জন্ম বরিশালে পিতা বামনচন্দ্র।

ছোটোদের জন্য লিখতে ভালোবাসতেন। ছোটোদের প্রথম শারদ বার্ষিকী পার্বণী তাঁর উদ্যোগে মুদ্রিত হয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে। সে সময়ের প্রায় সকল বিখ্যাত লেখক সচিত্র, এই সংকলনে লিখেছিলেন। নাটক, কবিতা, গল্প, ধাঁধা বিজ্ঞানমূলক লেখা সবই ছিল এই সংকলনটিতে।

দ্বিতীয় খণ্ড ‘পার্বণ’-তে (১৩২৭) বালক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এই দুজনের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী সীতা দেবী প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনা চিত্রশোভিত এই সংকলনে মুদ্রিত হয়েছিল।

১২.৮ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (স্যার: ১৮৬০ — ১৯৩০)

নবীনচন্দ্রের পুত্র কাশিমবাজার রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের ভাগনে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্য কলকাতায় শ্যামবাজারে। ১৮১৮ এর ৩০ মে ‘রাজা’ উপাধি সহ মাতুল-সম্পত্তি পান। শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বদেশি আন্দোলনের সক্রিয় সহায়ক মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত এক অর্থে নির্মিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন। বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রয়াসে শিশু’ নামের পত্রিকাটি ১৯১২ থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল প্রকাশিত হয়।

১২.৯ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩ – ১৯৩৮)

‘মাধব্য’ ছদ্মনামে লিখতেন। পিতার নাম বিশ্বেশ্বর, জন্মস্থান জলপাইগুড়ি শহর।

কলকাতা হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণির এম. এ. মনোরঞ্জন রিপন কলেজে রাজনীতি ও অর্থনীতি পড়াতেন। কিশোর মাসিক পত্রিকা ‘রামধনু'র সম্পাদক গোয়েন্দা হুকাকাশির স্রষ্টা মূলত কিশোরসাহিত্যিক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ’, ‘ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি’, ‘হুকাকাশির গল্প’, ‘সোনার হরিণ’, ‘চায়ের ধোঁয়া’, ‘এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে’, ‘হাস্য ও রহস্য' প্রভৃতি।

১২.১০ ‘মৌচাক’

১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২০) বৈশাখ থেকে কিশোরসাহিত্য পত্রিকা ‘মৌচাক’ সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায়। প্রকাশিত হতে থাকে। সচিত্র এই পত্রিকায় ভারতী’ ও ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর প্রায় সব খ্যাতনামা সাহিত্যিকই নিয়মিত লিখতেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বুড়ো আংলা’ পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। এ পত্রিকার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। পত্রিকাটি দীর্ঘকাল চলেছিল।

১২.১১ যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ – ১৯৩৭)

চব্বিশ পরগণার জয়নগর গ্রামে নন্দলালের পুত্র স্যার নীলরতন সরকারের দাদা যোগীন্দ্রনাথের জন্ম। ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান তার শিক্ষা শুরু হয় দেওঘরে। কলকাতার সিটি কলেজে ভরতি হলেও বিশেষ কারণে পাঠ শেষ করতে পারেননি। বৃত্তি ছিল শিক্ষকতা। দক্ষ শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা ভাষায় ছোটোদের জন্য রচিত প্রথম গ্রন্থ ‘হাসি ও খেলা’ (১৮৯১)র সংকলক। তাঁর রচিত ‘হাসিখুসি’ (১ম ১৮৯৭, ২য় ১৯০৪) বর্ণ পরিচয়ের বই হিসেবে অনন্য।

১৮৯৬-এ যোগীন্দ্রনাথ স্থাপন করেন প্রকাশনা সংস্থা সিটি বুক সোসাইটি'। তার গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংকলন গ্রন্থ ‘খুকুমণির ছড়া) '১৮৯৯) এবং জাতীয় সংগীত-সংকলন 'বন্দে মাতরম' (১৯০৫)। ‘হাসিরাশি’ (১৮৯৯), ছড়া ও পড়া’ (১৯১১), পশুপক্ষী’ (১৯১১), বনে জঙ্গলে (১৯২৯) তাঁর লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থ। ছোটোদের জন্য তিনি একুশটি পুরাণকথা ও তেরো-চোদ্দোটি পাঠ্য গ্রন্থও লিখেছিলেন।

১২.১২ রবার্ট লুই বালফুর স্টিভেনসন (Robert Louis Balfour Stevenson; ১৮৫০ – ১৮৯৪)

এই স্কটিশ লেখকের জন্ম এডিনবার্গ-এ। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভরতি হয় (১৮৬৭) শেষ পর্যন্ত পড়েন আইন। ১৮৭৫-এ অ্যাডভোকেট হয়েও বৃত্তি হিসেবে শুরু করেন সাহিত্যচর্চা। কর্নহিল ম্যাগাজিন' ('Cornhil Magazine') -এ তাঁর বেশির ভাগ লেখা বের হয়। প্রবন্ধ-কবিতা লিখলেও রোমাঞ্চকর কাহিনি রচনার জন্যই তিনি বিখ্যাত। ট্রেজার আইল্যান্ড ('Treasure Island' : ১৮৩৩) ভিন্ন · তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড' ('The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde'; ১৮৮৬)। দ্বিতীয় বইটিতে মনস্তত্ত্ব আর কল্পবিজ্ঞানের সুষম মিশ্রণ লক্ষিত হয়।

১২.১৩ রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪ - ১৯৬৯)

জন্মেছিলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। দেওয়ান কার্তিকচন্দ্রের পৌত্র নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাইয়ের ছেলে রবীন্দ্রলাল উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের শিষ্য মালবিকা কাননের পিতা রবীন্দ্রলাল রায় পাস করেছিলেন সংগীত বিশারদ' উপাধি পরীক্ষা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক রবীন্দ্রলাল রায় সংগীত বিষয়ে বিবিধ নিবন্ধের রচয়িতা। রাগনির্ণয়' তার লেখা সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ।

'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু 'দিনের খোকা রাতে' ও আর একটি কৌতুক-গল্পের লেখক রবীন্দ্রলাল রায়ের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই দু জন একই ব্যক্তি।

১২.১৪ লুইস ক্যারল (Lewis Carroll; Charles Lutwidge Dodgson-এর ছদ্মনাম : ১৮৫০-১৮৯৪)

শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ। শিক্ষা অক্সফোর্ড-এর ক্রায়েস্ট চার্চ-এ, এখানেই পরে তিনি গণিতের অধ্যাপনা করতেন। অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড' ('Alices's Adventures in Wonderland' : ১৮৬৫) এবং থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস অ্যান্ড হোয়াট অ্যালিস ফাউন্ড দেয়ার' ('Through the Looking Glass and What Alice Found There' : ১৮৭২) গ্রন্থ দুটি তাঁকে বিশ্বখ্যাত করে। দুটি বইয়ের বহু সংস্করণ হয়েছে: অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। দক্ষ ফটোগ্রাফার এবং কবি ক্যারল-এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'দ্য হান্টিং অফ দ্য স্নার্ক' ('The Hunting of the Snark' : ১৮৭৬), 'রাইম? অ্যান্ড রিজন?' ('Rhyme? And Reason?'; ১৮৮৩) প্রভৃতি। ইউক্লিড অ্যান্ড হিজ মডার্ন রাইভ্যালস ('Euclid and His Modern Rivals' : ১৮৭৯) তাঁর গণিতবিষয়ক গ্রন্থ।

১২.১৫ শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৭ – ১৯৮০)

মালদহের চাঁচলের রাজপরিবারের আত্মীয় শিবপ্রসাদ ও শিবরাণীর পুত্র শিবরাম দশম শ্রেণিতে পাঠ কালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ১৯১৯-এ ঘর ছেড়ে কলকাতায় আসেন। জীবিকা হিসেবে খবরের কাগজ বিক্রি আর নানা কাগজের সম্পাদনা—এমনই অদ্ভুত সব কাজ করেছেন তিনি। বড়োদের জন্য গল্প-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ—সবই লিখেছে প্রথম যৌবনে সাম্যবাদী এই সাহিত্যিক। প্রথম মুদ্রিত রচনা একটি কবিতা 'কোকিল ডাকে'। কবিতাটি বের হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতীপত্রিকায়। '

পরে ছোটোদের জন্য গল্প-উপন্যাস রচনাই হয় তার জীবিকা। প্রথম কিশোর গল্প ‘পঞ্চাননের অশ্বমেধ’ বের হয় মৌচাক’-এ। প্রথম কিশোর গল্প-সংকলন ‘পঞ্চাননের অশ্বমেধ’ (১৯৩৫)। প্রথম কিশোর উপন্যাস ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৩৭)।

কৌতকগল্প রচনায় নিপুণ শিবরামের বিশেষত্ব একই শব্দের দ্ব্যর্থক ব্যবহার। গোয়েন্দা গল্প আর ভূতের গল্পেও তিনি কৌতুক ব্যবহার করেছে। কৌতুকের সঙ্গে মানবিকতার সূক্ষ্ম মিশ্রণ তাঁর রচনার বিশেষত্ব। প্রায় দুশো গল্প-উপন্যাসের লেখক শিবরাম ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' (১৯৭৪) নামের একটি অনবদ্য স্মৃতিকথাও লিখেছেন।

‘শিশু’ :

কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে “শিশু’ নামের কিশোর পত্রিকাটি বের হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। পাঁচ বছর স্থায়ী এই পত্রিকাটিতে চলিত ভাষায় লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, জীব বৃত্তান্ত, ধাঁধা প্রভৃতি মুদ্রিত হত। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, কালিদাস রায় প্রমুখ সমকালের প্রসিদ্ধ লেখকগণ পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখতেন।

সন্দেশ’ :

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় সন্দেশ’ রঙিন প্রচ্ছদ এবং বহু চিত্র-শোভিত হয়ে বের হতে থাকে ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৩) বৈশাখ থেকে। পত্রিকাটিতে গল্প-কবিতা, ছড়া, ধাঁধা, বিবিধ বিষয়ে রচনা, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ, ছোটোদের চিঠি, স্বরলিপি সহ গান মুদ্রিত হত। রবীন্দ্রনাথের ‘সে’ এ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর (১৯১৫) পরে তাঁর পুত্র সুকুমার রায় পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। ১৯২৩ এ তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। ১৯৩১ থেকে কয়েক বছর সুবিনয় রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় মুদ্রিত হয় এই পত্রিকা।

১৯৬২ থেকে পত্রিকাটি সত্যজিৎ রায়ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে একটি যুগের সূচনাকারী পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১২.১৬ সুখলতা রাও (১৮৮৬ – ১৯৬৯)

জন্ম কলকাতায়, পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেছে। ১৯০৭-এ ওড়িশার ডা. জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে বিবিধ সমাজসেবামূলক কাজ করেছে। এ জন্য তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ পদক দেওয়া হয়। চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় সর্বসমেত কুড়িটি গ্রন্থের রচয়িতা সুখলতা 'নিজে পড়' বইটির জন্য ভারত সরকারের পুরস্কার পান। উল্লেখ্য গ্রন্থ 'লালিভুলির দেশে', 'পথের আলো', নানান দেশের রূপকথা নতুন ছড়া', 'খেলার পড়া', 'আরো গল্প' (১৯১৫), 'গল্পের বই' (১৯১৫) প্রভৃতি।

১২.১৭ সুধীরচন্দ্র সরকার (১৮৯২ - ১৯৬৮)

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র সুধীরচন্দ্রের জন্ম। পিতা ছিলেন আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং আইন-বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশনা সংস্থা রায় এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স এর স্থাপয়িতা। ১৯০৭-এ এন্ট্রান্স এবং পরে বি.এ. ও আইন পরীক্ষায় পাস করেন সুধীরচন্দ্র।

স্বয়ং সাহিত্যিক হলেও সুধীরচন্দ্র সাহিত্য-অনুরাগী হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তিনি পিতার প্রকাশনীকে করে তোলেন সাহিত্য গ্রন্থের প্রকাশনী। তাঁর সম্পাদনায় কিশোর-পত্রিকা 'মৌচাক' (১৯২০) এবং প্রেরণায় অভিনয় শিল্প সংক্রান্ত পত্রিকা 'নাচঘর' মুদ্রিত হয়। রচিত গ্রন্থ 'পৌরাণিক অভিধান', 'জীবনী অভিধান', 'বিবিধার্থ অভিধান', সম্পাদনা ও প্রকাশক 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক'।

১২.১৮ হারবার্ট জর্জ ওয়েলস (Herbert George Wells : ১৮৬৬ – ১৯৪৬)

বিজ্ঞানের ছাত্র এই ইংরেজ কথাসাহিত্যিকের জন্ম কেন্ট (Kent) -এর ব্রুমলি (Bromley) -তে। নানা ধরনের কাজের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষকের কাজও করেছে। বিশ্বরাষ্ট্র এবং মানবাধিকারের প্রবক্তা আর সক্রিয় কর্মী ওয়েলস সায়েন্স ফিকশন'-এর জনক হিসেবে খ্যাত। যদিও তিনি কয়েকটি কৌতুক-উপন্যাস আর প্রবন্ধ-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। 'দ্য টাইম মেশিন' ('The Time Machine' : ১৮৯৫), 'দি ইনভিজিবল ম্যান' ('The Invisible Man' : ১৮৯৭) আর দি ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস' ('The War of the Worlds' : ১৮৯৮) তাঁর বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনি।

১২.১৯ হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসন (Hans Christian Anderson : ১৮০৫ - ১৮৭৫)

ডেনমার্ক-এর সাধারণ ঘরের এই ছেলেটি কোপেনহেগেন যান থিয়েটারের কাজ করতে। লেখার ক্ষমতার জন্য তাঁর পৃষ্ঠপাোষক হন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। ১৮৩৩-এ রাজপ্রদত্ত ভ্রমণভাতা নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণের পর তিনি রচনা করেন কবিতা, নাটক, উপন্যাস এবং ভ্রমণকথা। তবে মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে একগুচ্ছ রূপকথার জন্য। সেগুলি মুদ্রিত হয় ১৮৩৫-এ; ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮৪৬-এ। তাঁকে বলা হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকথক। দ্য টিন সোলজার' ('The Tin Soldier') 'দ্য লিটল মারমেড' ('The Little MarImaid'), দি আগলি ডাকলিং' ('The Ugly Duckling') তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ রূপকথা।

১২.২০ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৬০৮ - ১৬৭৪)

ভারতী' গোষ্ঠীর কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়। দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রথমে ওকালতি করলেও পরে অধ্যাপনাকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৩-এ মুদ্রিত হয় তাঁর নতুন খাতা' কবিতা-সংকলন। বেশ কিছু কিশোরপাঠ্য কবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতাও তিনি লিখেছিলেন।

জন মিলটন (John Milton : ১৬০৮ - ১৬৭৪)

ইংরেজ কবি। জন্ম লন্ডন-এ। শিক্ষা সেন্ট পলস স্কুল ও ক্রাইস্ট চার্চ (কেম্ব্রিজ)-এ ১৬২৯-এ স্নাতক হন। ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজি ও লাতিন-এ কবিতা লিখতেন। পিউরিটান মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের বিরোধী মিলটন-এর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে উল্লেখ্য রচনা 'অ্যারিওপ্যাগেটিকা' "Areopgitica, ১৬৪৪)।

দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। পরে অন্ধ হয়ে যান। সেই সময়ের রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' ('Paradise Lost' : ১৬৬৭)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে শয়তানের ঈশ্বর-বিদ্রোহ ও আদম-১৬৭১এর স্বর্গচ্যুতি এ কাব্যের বিষয়। -ইভ-এ বের হয় তাঁর প্যারাডাইস রিগেনড' ('Paradise Regained') এবং নাট্যকাব্য স্যামসন অ্যাগোনিসটেস ('Samson Agonistes')। অনুভব-গাঢ় বেশ কিছু সনেটও তিনি লিখেছেন।

জোহান উলফগ্যাং ভন গ্যয়টে (Johann Wolfgang Von Goethe : ১৭৪৯ - ১৮৩২)

ক্যাথারিনা এলিজাবেথ ও জোহান ক্যাসপার-এর পুত্র প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। বহু নাটক-উপন্যাস, কবিতা, গান লিখলেও দু খণ্ডে বিভক্ত কাব্যনাট্য 'ফাউস্ট'-এর রচয়িতা হিসেবেই খ্যাত ('Foust': ১ম, ১৮০৩, ২য় ১৮৩২)।

দান্তে অলিগিয়েরি (Dante Alighieri : ১২৬৫ - ১৩২১)

ফ্লোরেন্স-এ জাত এই ইতালীয় কবির জীবনী সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে ১৩০২ থেকে তাঁর বাকি জীবন কাটে নির্বাসনে। প্রথম গ্রন্থ 'লা ভিতা নুওভা' ('La Vita Nuova' নতুন জীবন' ১২৯৫)। মোট একত্রিশটি গ্রন্থের রচয়িতা দান্তের সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থ 'লা দিভিনা কোমমেদিয়া ('La Divina Commedia' : 'The Divine Comedy' : ১৩০৭–১৩১০)। তেত্রিশ সর্গের কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত ইনফানো' (Inforno') বা প্রেতলাোক পুরগাতাোরিও , ('Purgatorio)বা শুদ্ধি লোক এবং 'পারাদিসো বা স্বর্গ (Paradiso')। উল্লেখ্য অন্যান্য রচনা কনভিভিও' ('Convivio') ১৩০৪ ১৩০৮)। 'দেমনারকিয়া' ('Demonarchia' : 'রাজতন্ত্র' ১৩১০–১৩১২) প্রভৃতি।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮ — ১৯৩২)।

পরাধীন ভারতের অন্যতম দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ বিপিনচন্দ্রের জন্ম শ্রীহট্ট জেলায়। ১৮৭৪-এ শ্রীহট্ট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে কলকাতার কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তিনি সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গের পরের বছর ১৯০৬-এ তাঁর সম্পাদনায় বের হতে থাকে ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম'। এ সময় পত্রিকা সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য না দেওয়ায় ছ-মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। বয়কট আন্দোলনের প্রবর্তক বিপিনচন্দ্র খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন।

ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য ইতিহাস—বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী বিপিনচন্দ্র এসব বিষয়ে লিখেছেন কয়েকটি গ্রন্থ। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ — ১৯২১)

পৈতৃক নিবাস নদিয়ার অংশুমালী বা আঁশমালী গ্রামে। জন্ম কলকাতায়। পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। মা হেমলতা বিদ্যাসাগরের বড়ো মেয়ে। পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে মাতামহ-গৃহে পালিত হন। বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কৈশোর থেকেই সাহিত্য চর্চার শুরু। সৎ সম্পাদক ও নির্ভীক ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ-সাহিত্য সমালোচক হিসেবে পরিচিত বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা সুরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

সম্পাদিত পত্রিকা : 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙ্গালী', 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' এবং সাহিত্য। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (১৮৯০) তিনি সাহিত্য সম্পাদনা শুরু করেন। এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধ। রচিত গ্রন্থ : কল্কিপুরাণ', 'সাজি', 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত', প্রভৃতি।

সম্পাদিত গ্রন্থঃ 'আগমনী', 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

১২.২১ অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন :

১। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের গঠন-বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

২। বাংলা শিশুসাহিত্য বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সংরূপটির গঠনদক্ষতার অন্যতম নিদর্শন। – মন্তব্যটি যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক - মন্ময়তা আর তন্ময়তার যথাযথ সম্মিলনে রচিত সার্থক প্রবন্ধ – মন্তব্যটির যথার্থতা যুক্তি দিয়ে বিচার করুন।।

৪। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব বিষয়ে উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৫। অনুভবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। — মন্তব্যটির বিশদ আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। রামায়ণ'–প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর অনুভবঋদ্ধ প্রবন্ধ হিসেবে মূল্যবান। - মন্তব্যটির যৌক্তিকতা

বিচার করুন।

২। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের প্রারম্ভ অধ্যায়ের সঙ্গে অন্য অধ্যায়গুলির অন্বয়ের দিকটি ব্যাখ্যা

করুন।

৩। বিষয়মুখ্য প্রবন্ধ, অনুভব প্রধান প্রবন্ধ, তন্ময়তা ও মন্ময়তা মিশ্রণজাত প্রবন্ধ – তিন শ্রেণির প্রবন্ধের

২। গঠন বিশেষত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলাোচনা করুন। বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যের স্বচ্ছ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু নতুন শব্দ নির্মাণ করেছিলেন। — তাঁর। নির্মিত শব্দসমূহের বিশেষত্ব উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

১২.২২ গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ সুদক্ষিণা বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭

দাস প্রভাতকুমার কবিতা পত্রিকা সূচিগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু আমাদের কবিতাভবন, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০১

বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসু আমার যৌবন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯

বুদ্ধদেব বসু কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৯

বসু সুদীপ বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭

একক ১৩ - প্রবন্ধ সংগ্রহঃ প্রমথ চৌধুরী

বিন্যাসক্রম

১৩.১ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী - ভূমিকা

১৩.২ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে বলার বিষয়ের চেয়ে বলার ভঙ্গি বড় হয়েছে

১৩.৩ বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ

১৩.৪ সংক্ষিপ্তসার

১৩.৫ আলোচনা

১৩.৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১৩.৭ জয়দেব

১৩.৮ অনুশীলনী

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী - ভূমিকা

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ পর্বে প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জ্বল প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্য ও তত্তপণ প্রবন্ধের সার্থক

স্রষ্টা। যুক্তিবাদী ও তথ্যপূর্ণ ভাবনায় তিনি তার মননশীল প্রবন্ধ সম্ভারকে সুললিত শব্দ ও সংযত বাক্য বিন্যাসে সুসজ্জিত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধাবলীকে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণিতে বিভাজন করা যেতে পারে—

১। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ—জয়দেব, বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ, সবুজপত্র, সাহিত্যে খেলা, সবুজপত্রের মুখপত্র, বর্তমান বঙ্গসাহিত্য, বইপড়া, ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়, রামমোহন রায়, মহাভারত ও গীতা, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি।

২। ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ—সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা, বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধু ভাষা, আমাদের ভাষার সংকট, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি।

৩। সমাজ কেন্দ্রিক প্রবন্ধ—তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা, বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ, নূতন ও পুরাতন, পূর্ব ও পশ্চিম প্রভৃতি।

৪। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের ঐক্য, ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি, ভারতবর্ষ সভ্য কিনা, কংগ্রেসের দলাদলি, সাহিত্য বনাম পলিটিকস, গত কংগ্রেস প্রভৃতি।

৫। সঙ্গীত বিষয় প্রবন্ধ -হিন্দু সঙ্গীত, সুরের কথা প্রভৃতি।

৬। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্য রচনা—আমরা ও তোমরা, খেয়াল খাতা, বর্ষার কথা, ফাল্গুন, রূপের কথা, বর্ষার দিন প্রভৃতি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৩৫৯ সালে ৫০টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর - সংগ্রহ (১ম খণ্ড) এর ভূমিকাপত্র লেখেন।

১৩.২ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে বলার বিষয়ের চেয়ে বলার ভঙ্গি বড় হয়েছে

রবীন্দ্র-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী। এক বিশিষ্ট আসন অলংকৃত করিয়াছেন। তাহার সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল। তিনি স্বনাম অপেক্ষা এই ছদ্মনামেই সমধিক পরিচিত। প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি, গল্পলেখক ও প্রবন্ধকার এবং প্রধানতঃ তাঁহার প্রবন্ধের রূপ-রীতি ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছেন। কিন্তু সর্বোপরি প্রমথ চৌধুরীর মুখ্য কৃতিত্ব তাহার যুগান্তরকারী মাসিক পত্রিকা ‘সবুজপত্র’ সম্পাদন ও বাংলা গদ্যের এক অভিনব রীতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই গদ্যরীতি ‘বীরবলী ঢঙ’ নামে আখ্যাত হইয়াছে। তিনি ‘বীরবলী ঢঙ' অর্থাৎ এক প্রকারের শুষ্ক, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তির্যক দ্যোতনাবিশিষ্ট বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী রচনারীতি’র প্রবর্তক। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ ও অন্যান্য সকল রচনার ক্ষেত্রেই এই নূতন ‘স্টাইল বা রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং তাহার সর্বাধিক গৌরব এই যে, রবীন্দ্র-পর্বে আবির্ভূত হইয়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বব্যাপী আলোকরশ্মি প্রমথ চৌধুরীর বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র-চিহ্নিত বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি অনুজ্জ্বল বা ম্লান করিতে সক্ষম হয় নাই।

প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত ‘বীরবলী ঢঙে’র মুখ্য উপাদান কথ্য অর্থাৎ চলিত ভাষা। তিনি প্রচলিত সাধু গদ্যভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন রূপে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় ও গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ঘন চিন্তা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগিতা যে চলিত ভাষার মধ্যেও বর্তমান, তাহা স্বয়ং প্রমথ চৌধরী বিবিধ জটিল, দুরূহ ও গুরুগম্ভীর বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। চলিত ভাষার যুক্তি-বিচারনিষ্ঠা, মননশীল অথচ রসঘন প্রবন্ধে অন্যতম কৃতী লেখক যে প্রমথ চৌধুরী,তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে চলিত ভাষাভিত্তিক রচনারীতি টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থদ্বয়ে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই চলিত ভাষা ও রীতির মধ্যে চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি-জাত শিল্প সৌন্দর্যের অভাব ছিল। সাধু ভাষার ন্যায় বা হুতোমী ভাষার শিল্পরূপ রচনায় কোনরূপ সতর্ক অনুশীলন বা কলা শিল্পসম্মত উন্নত কোন প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বীরবলী চলিত ভাষা প্রমথ চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাধনা ও সৃজনধর্মী মনের আন্তরিক প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা (sanity) ও বহির্বয়ব আঙ্গিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ। বীরবলী রীতি বাংলা সাধু গদ্যরীতি অপেক্ষা কোন অংশেই অপকৃষ্ট ও দুর্বল নহে। তাত এর বাংলা সাহিত্যে বীরবলী গদ্যভাষাই সর্বপ্রথম পর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক চলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে চলিত ভাষার সাহিত্যিক রূপায়ণের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র পরেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, পত্র-সাহিত্যে এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন লেখকের কোন কোন রচনার মধ্যে চলিত ভাষা ও রীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলালী বা হুতোমি ভাষা অপেক্ষা তাহাদের চলিত ভাষা অধিকতর সুকর্ষিত ও সংযত-শোভন হলেও তা সাধারণ পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় না এবং উল্লিখিত লেখকদের মধ্যেও চলিত ভাষা ও রীতির ব্যাপক প্রচলনেও কোন অদম্য ঐকান্তিক প্রয়াস বা সুগাভীর সাহিত্য-নিষ্ঠার পরিচয় লাভ করা যায় না। তাহাদের চলিত ভাষার সাহিত্যচর্চা সাময়িক উত্তেজনা বা খেয়াল জাত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে ভ্রমণ বা ডায়ারি জাতীয় কয়েকটি রচনায় মাত্র চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বিচিত্র বিষয়াশ্রি তার অধিকাংশ রচনায় সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর থেকেই এবং মুখ্যতঃ তারই একান্ত উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তার বিবিধ সাহিত্য-কর্মে চলিত ভাষা ও রীতি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষাভিত্তিক সুমার্জিত গদ্যরূপ ও

রীতির মূলে প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা ভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধের রচনা-সৌকর্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে লিখেছেন—

"তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথাও ফাক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি।"

রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু বীরবলী প্রবন্ধের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। উভয় মনীষীর প্রবন্ধগত ভাব-বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে প্রমথ চৌধুরীর প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য অধিকতর স্পষ্টগোচর হয়। অভিনব বীরবলী রীতির জন্য প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ একক ও অনন্য সাধারণ চারিত্রিক তাৎপর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ প্রথাসিদ্ধ প্রবন্ধের মানদণ্ডে যেমন রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না, তেমনি প্রচলিত প্রবন্ধের সংজ্ঞানুসারে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধও বিচার্য নয়। কারণ, সাধারণ প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ তার প্রবন্ধেও যথাযথভাবে পরিস্ফুট হবার অবকাশ পায় না। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও পরিধির বিস্তৃতি সাধনে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অবদানের সমতুল্য না হলেও প্রমথ চৌধুরীর দানও উপেক্ষনীয় নয়। বিশেষতঃ, বাংলা প্রবন্ধের প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে "বীরবলী ঢঙ" বা রীতি যে এক ব্যতিক্রম, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বিষয় নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্র প্রবন্ধ-রীতি ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনাশৈলী এই উভয়ের পারস্পরিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ-ধর্মের আলোচনা করা যেতে পারে। বীরবলী রীতি যে স্বকীয় স্বাতন্ত্রে মহিমান্বিত ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত তা আলোচনা থেকে সমভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয় মনীষীরই প্রবন্ধ রচনারীতিতে তাঁহাদের পরিশুদ্ধ বিদগ্ধ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ Style is the Man অর্থাৎ রচনাশৈলীতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন—এই অর্থবহ মন্তব্যটি উভয়ের রচনাক্ষেত্রেই সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু বীরবলী ব্যক্তিস্পর্শযুক্ত রচনারীতি রবীন্দ্র-নীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে মুখ্যতঃ বিদগ্ধ মনীষীর বুদ্ধিজাত

চিন্তা-ভাবনার লঘু চপল খেয়ালীরূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি অতএব, আত্মভাববিমুগ্ধ কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিসঞ্জাত যুক্তির মধ্যেই তার প্রবন্ধ বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। বীরবলী রীতি বুদ্ধিপ্রধান, রবীন্দ্র-রীতি হৃদয়প্রধান। তথ্য-যুক্তিসমন্বিত বাগবৈদগ্ধ্যই বীরবলী গদ্যরীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিজাত সামগ্রী বা উপকরণ তার স্বভাবসিদ্ধ কবিমানসের সিন্ধ-লাবণ্যে কমনীয় ও রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। রচনাকে যথাসম্ভব হৃদ্য ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে বক্রোক্তির ব্যবহার যে কিরূপ কার্যকরী, রবীন্দ্র-প্রবন্ধে বক্রোক্তি-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর বক্রোক্তিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ ব্যঞ্জনাবাহী না হইয়া নিছক বাক্য বা শব্দের কলাকৌশল মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপক ইত্যাদি বিবিধ অলংকার দ্বারা রবীন্দ্র-প্রবন্ধের কেবলমাত্র বাহ্যিক অঙ্গ-গোষ্ঠবই গঠিত হয় নাই—এই সকল অলংকার তাহার প্রবন্ধগত বিচিত্র ভাব বা রসাভিব্যক্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যাবহৃত অলংকারসমূহ অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গমূলক, রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ন্যায় তাহা গভীরভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি।

Paradox অর্থাৎ আপাত-অসম্ভব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার বীরবলী রীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা বিদ্রুপাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি বহুলক্ষেত্রে আয়াসাধ্য হলে এর অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্যেই বীরবলী ঢঙের স্বাতন্ত্র্য নিহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বীরবলসুলভ শ্লেষ-ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গির কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ পায়নি। তা হাস্যরস করুণ-মধুর সৌকুমার্য স্নিগ্ধ হয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে 'অঙ্গগত বৈশিষ্ট্য ও ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির পেছনে তার ভাষা-শিক্ষা ও চর্চার এক গভীর প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগরের রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারবহুল কাব্য-ভাষা ও রচনারীতি ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রমথ চৌধুরীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং শেষপর্যন্ত তিনি বাকচাতুর্যে সুনিপুণ, বুদ্ধিজীবী কবির একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং যে

ভারতচন্দ্রের ভাষাও অনুশীলন করেছিলেন, 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তার অকপট স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

"ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।"

প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনা-বৈদ্য, উপমা-অলঙ্ককরণ, চাতুর্যময় বাচনভঙ্গি ও ব্যঙ্গ প্রিয়তা যে কবি ভারতচন্দ্রের মনোধর্মেরই ছায়াতলে গঠিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যদিও সাহিত্যগত রসরুচির ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত মার্জিত, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। ভারতচন্দ্রের পরেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায়ও বাগ বৈদ্য ও লঘু ব্যঙ্গ-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরস, তীক্ষ্ণ স্পষ্ট ও শ্লেষ-বিদ্রুপাত্মক রচনাভঙ্গি র প্রভাবও বীরবলী ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত হয়।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যানুরাগী মনস্বী ব্যক্তি। ইংরাজী ও ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্যেরও তিনি উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বিশেষত, ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাহার সুগভীর প্রীতি ও অসামান্য বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী গদ্যের সুমার্জিত রূপ ও প্রসাদগুণ এবং সংযম ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতার মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী তাঁহার স্বাভাবিক রুচি মানসপ্রবণতার যথাযথ উপাদান বা সামগ্রীর সন্ধান লাভ করেছেন। তা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী গদ্যভাষা ও রীতির বিশিষ্ট গুণগুলি আত্মস্থ করিয়া তিনি তাহার গদ্যভাষা। ও প্রকাশভঙ্গি অধিকতর মার্জিত, প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে তুলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপপ্রধান পরিহাস-রসিকতা, ভাবালুতাশূন্য ও সংস্কারবিমুক্ত মননশীলতা বহুল পরিমাণে ফরাসী স্বভাবের সমধর্মী হয়েছে। অতএব তার সমার্জিত ও অনন্য -সুন্দর গদ্যভাষা ও রীতি অর্থাৎ বীরবলী ঢঙের পশ্চাতে ফরাসী গদ্যের প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না। ফরাসী সাহিত্যের সহজ স্বাভাবিক স্বরূপ-ধর্ম ও সুস্পষ্টতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং তার ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয় নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।

'ফরাসী মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় দেখা যায় না, ফরাসী মন স্বভাবতই তা দেখতে চায় না। এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের

সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী সাহিত্যে বড়-একটা পাওয়া যায় না। ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা স্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম।'

ফরাসী সাহিত্যের চারিত্রিক লক্ষণ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'বীরবলী ঢঙে'র প্রবর্তনা হইতে প্রমথ চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাহিত্যচিন্তা এবং দেশী ও বিদেশী বিবিধ ভাষা-শিল্পের সহিত তাঁহার সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এই স্বতন্ত্র অভিনব রচনাভঙ্গি বহুল ক্ষেত্রেই প্রবন্ধের বিষয়গত মহিমা খর্ব করেছে এবং প্রমথ চৌধুরী যে, নিছক রীতিবাদী (stylist) লেখক এই অভিধাও তার উপর আরোপিত হইয়াছে। যদিও প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষাকৃত রীতিসর্বস্ব লেখক তথাপি তাহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং চিন্তা স্বাতন্ত্রেও অনন্যসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাহার চলিত ভাষাশ্রিত তিক রূপভঙ্গিতে বহু বিচিত্র প্রসঙ্গের আলোচনা করে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্রে নুতন ভাব ও চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছেন। কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনা নহে, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ই প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়েছে।

১৩.৩ বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ

প্রমথ চৌধুরীর 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধটি ভারতী পত্রিকায় ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী একেবারেই সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একেবারে সম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ রচনার তিনি এখানেই পথ পস্তুত করলেন। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন সাম্প্রতিক কালে বহু মানুষের মধ্যে বহু বিষয় নিয়ে লেখার একটা

ঝোঁক এসেছে। তিনি লিখেছেন—"এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন এই নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।" প্রমথ চৌধুরী এখানে ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

লেখক প্রবন্ধের প্রথমাংশে জানিয়েছেন যে বঙ্গ সাহিত্যে একটি নুতন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই সাহিত্যের নবযুগের ফসল স্বল্পজীবী হবে না দীর্ঘজীবী হবে তা তিনি বলতে পারেন না। লেখক লিখেছেন—"এই নব সাহিত্যের বিষয় লক্ষণগুলির বিষয়ে যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তাহলে যুগধর্ম অনুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।"

প্রথম দেখা যায়—'এই নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে' অতীত কালে অন্যদেশে যেমন সাহিত্যের জগতে দু'চার জনের অস্তিত্ব ছিল আমাদের দেশেও সাহিত্যও তেনি দু'চারিজনের অধিকারে ছিল। সাহিত্যের জগতে দু'চার জন কবি আর ছিলেন রাজা জমিদার। কবিগণ রাজ অনুগ্রহ লাভ করলে ধন্য হতেন। প্রাচীনকালে সাহিত্যে দর্শনে শিল্পকলায় চিরস্থায়ী কীর্তি থেকে গেছে কিন্তু বর্তমানে আমরা শিল্প সাহিত্যের সেই উর্ধ্বতন স্তরে পৌছাতে পারব না এই জ্ঞান যদি আমাদের হয় তবে শিল্প সাহিত্যে রাজা হবার লোভ আর আমাদের থাকবে না। এর জন্য আমাদের কোন দুঃখপ্রকাশের অবকাশও থাকবে না।

দর্শনে, ধমে, সৌন্দর্যের জগতে ঐশ্বর্য লাভ করার দিন চলে গেছে। পুরাকালে শিল্প ও সাহিত্যের জগতে যা কিছু ঘটেছে তা কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর কয়েকজন মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। কিন্তু নব যুগের সাহিত্য হল মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন। নব যুগের সাহিত্যে স্রষ্টা হিসাবে পাঠক হিসাবে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার। সেজন্যই প্রাবন্ধিক লিখেছেন "প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে। ...মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে।" এই কাব্য, সাহিত্য শিল্প দর্শন বৃক্ষের মতো আকাশের দিকে উচু হয় উঠবে না, দাসের মতো বিস্তৃত হয়ে চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়বে। বহু শক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক সাহিত্যিকের পরিবর্তে স্বল্প শক্তিশালী বহুসংখ্যক সাহিত্যিক এযুগের সাহিতে এসেছে এবং আরো আসবে। এযুগ মাসিক পত্রের যুগ। ছোট বড় মাসিক পত্রের জন্য এ যুগের লেখকদের জন্য প্রতি নিয়ত লিখতেই হবে। সে লেখা গুণমানে আকার আয়তনে যাই হোক না কেন।

লেখক লিখেছেন, "তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটগল্প, খণ্ড কাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।" সাহিত্য আকারে ক্ষুদ্র হলে ও তাতে খেদের কিছু নেই, খেদ তখনই হবে যদি সে সাহিত্য ফাঁপা, অতঃসারশূন্য হয়। সোনার বালা ফাঁপা গলা ভরা হলেও চলে কিন্তু সোনার আংটি ফাঁপা হলে চলে না। সাহিত্যের দম না থাকলেও কস (grip) থাকা আবশ্যক।

বর্তমান সাহিত্যের প্রধান কোক বৈশ্য ধর্মের দিকে। অর্থাৎ অর্থ উপার্জনমুখী ব্যবসামুখি সাহিত্য হলে সাহিত্যে পরিণাম ভয়াবহ। আমাদের আত্মসর্বস্ব দেশে লেখকগণ যে বৈশ্যবৃত্তি হলেন করবেন না একথা বলা যায় না। লক্ষ্মী লাভের আশায় সাহিত্যিকগণ। অনেকে সরস্বতী কপট সেবা করে থাকেন।

এখন হয়ে দাড়িয়েছে বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী লেখকদের মধ্যে সরস্বতী ব্যবসা জমিয়ে রামরাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। সাহিত্য সামজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার ইচ্ছা থাকলে দারিদ্র্যেকে ভয় পেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" লেখক মনে করেন এযুগের মাসিকপত্র সচিত্র হয়ে উঠছে সেটা যেমন আনন্দের কথা তেমনি অবান্তর কথা। শেষে চিত্রটা প্রধান হয়ে উঠবে। যা সাহিত্য হবে অপ্রধান মেকি সাহিত্য বাজার মাৎ করবে চিত্রের মাধ্যমে। সাহিত্য ব্যবসায়ী গণ চিত্র দেখিয়ে সাহিত্য শিশুপাঠ্য করে তুললে সমূহ বিপদ। চিত্র যদি সাহিত্যের বাজার বাড়ায় তবে তার থেকে দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। মুখ্য বিষয় গান। কিন্তু বাজনা বদি গানকে ছাড়িয়ে ওঠে তবে গানের গরিমা আর থাকে না। নর্তকীর পশ্চাতে সারঙ্গীর মতো কাব্যের পশ্চাতে চিত্র ধাবিত হলে কাব্যের মর্যাদা বিঘ্নিত হয়। চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও একসঙ্গে সাহিত্যবিদ এমন মুখী পটু সহজলভ্য নয়। প্রমথ চৌধরী মনে করেন নবচিত্ররদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান ভুল ও রেখায় রেখায় ব্যাকরণ ভুল দেখা যায়। চিত্রকর্ম ও

ভাষা এই দুই-এর উপর সমাজ দক্ষতা অর্জন সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো, তার অতিকৃতি দেওয়া আর্টের ধর্ম নয়। আর্টের কাজ অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। তাই বস্তু জগতের সঙ্গে মনের জগত বা কল্পনার জগতে

হুবহু মিলিয়ে দেওয়ার দায় আর্টের থাকে না। শিল্পীর কলাবিদ্যা আর গণিত শাস্ত্র এক নয়। একে একে দুই হয় আবার একের পিঠে এক শিখলে এগারও হয়। এটাই শিল্প। আবার শিল্পের ভাবনা '১' নানা ভাবে সজ্জিত করে সুন্দর আলপনার নকশা তৈরি হতে পারে। গণিতের সত্য, সাহিত্যের সত্য আর শিল্পের সত্য এক হতে পারে না। প্রকৃতি যে অংশটির সঙ্গে এবং ভাবের সঙ্গে চোখের ও মনের যোগ সেই অংশটুকুই কেবল সত্য বাকি সব মিথ্যা এটা হতে পারে না। যদি হয় তবে অন্ধের হস্তী দর্শন হয়ে যাবে। বাস্তবের ঘোড়া আর ছবির ঘোড়া, কিংবা অস্থিবিদ্যার ঘোড়া আর সাকটবাহী ঘোড়ার গঠন এক হতে পারে না। ‘কঙ্কাল’ গল্পে রবীন্দ্র একথাই বলতে চেয়েছেন। অস্থিবিদ্যার ছাত্রটি দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা কঙ্কালটি দেখে বুঝতেও পারবেন না ঐ কঙ্কালটি সুন্দরী অষ্টাদশীর লাবণ্যময় দেহের কঙ্কাল।

প্রথমতঃ কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকচক্ষুর পরিচয় নেই, কিন্তু দেহের পরিচয় আছে। কাল আমাদের মনে ভীত বা ঘৃণার সঞ্চার করে সুঠাম শরীর আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। শিল্পের ক্ষেত্রের কথা প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জীবদেহ গঠনের ভঙ্গির কারণ আছে। ঘোড়ার দেহ গঠন এমন যে দৌড়ানো তার স্বভাবধর্ম। আর এটাই চিত্রের ঘোড়া ও বাস্তবে ঘোড়ার চেহারার প্রধান পার্থক্য। সাহিত্যের প্রকৃতি যোগ নিরন্তর, অবিচ্ছেদ্য একথা সাহিত্যিককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে। লেখক মনে করেন এযুগের সাহিত্যিকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্য বস্তুর, আর লেখার বিষয় হল অদৃশ্য বস্তু। তাদের ভ্রান্ত ধারণা বস্তুবিকা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্য কলায় বর্জনীয়। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষভানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। সাহিত্য রচনা ও পাঠের জন্য বাহিরে দৃষ্টি ও অন্তরের। দৃষ্টি এই দুটি দৃষ্টি সক্রিয় রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় রেখে কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। বস্তু জ্ঞানের অটল ভিত্তির উপর কবি কল্পনা প্রতিষ্ঠিত। লেখক মনে করেন মানসিক আলস্যবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ

দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি নে তার প্রধান কারণ আমাদের চোখ ফোটার আগে মুখ ফোটে। | আমরা বাহ্য বস্তুর প্রতি বিরক্ত কিন্তু আমাদের অহং-এর প্রতি আমরা। অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস আমাদের মনে যে চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় সেগুলি মহর্ষি। মানুষ মাত্রেরই সব সময় সময় নানাপ্রকার ভাবের উদয় বিলয় ঘটে। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাবের উদ্রেক করা। কবির নিজেকে বীণা হিসাবে না দেখে বাদক হিসাবে দেখা উচিত। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক নব্য লখকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন "নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রানি ৯ থে তারা যেন দেশি বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক, অন্তত নিজের উপকার করা হবে। প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গসাহিত্যের নব যুগ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ চিত্রকলা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার জন্য প্রবন্ধটি বিষয়গত কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে শেষপর্যন্ত প্রাবন্ধিক একথাই বলেতে চেয়েছেন যে বস্তুরূপ সম্পর্কে উদাসীন হলে চিত্রকলা ও সাহিত্য কোনটাই সাফল্য লাভ করতে পারে না, ভারতীয়রা প্রধানত ভাববাদী এবং সে ভাব হল আত্মভাব। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সত্যতার উপর ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিতে গেলে তা শিল্পের মর্যাদা হানী ঘটায়।

প্রবন্ধে শেষে প্রাবন্ধিক নব্য লেখকদের সচেতন করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন অবহেলায় কোন লেখাই উচিত নয়। লেখকের নিজের সচেতন ভাবনার উপর সর্বদা নির্ভরশীল হতে হবে। সাহিত্যে আত্ম স্বতন্ত্র বোধের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

১৩.৪ সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান যুগকে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগ বলা যায়। কারণ লেখবার ঝোঁক এখন প্রবল হয়েছে। এই যুগের এইটাই প্রথম লক্ষণ যে নবসাহিত্য রাত ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক নেরে দিন চলে গিয়ে বড় শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। মাসিকপত্র ভরাবার জন্য সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হচ্ছে। তাই লেখা হচ্ছে শুধু ছোটো গল্প, খণ্ড কাব্য, সরল বিজ্ঞান

ও তরল দর্শন। এর জন্য আমার কোনো যে নেই; কিন্তু সাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি দমন করা প্রয়োজন। এ যুগের মাসিক পত্রগুলি যে চিত্র হয়ে উঠেছে তাতে যেমন আনন্দ আছে তেমনই আশঙ্কাও আছে। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সব ছবি অনেক সময়েই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর মত বাস্তব নয়। এর থেকে এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস হয়েছে যে ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্যমন। সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়। কিন্তু কাব্যে কৃতিত্বলাভের জন্য ইন্দ্রিয় সচেতন ও সজাগ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতিক উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্ব শক্তি। বিজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলব্যবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ।

একদিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি বিরক্ত, অপরদিকে অহংএর প্রতি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যেসব চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তা অপূর্ব ও মহার্য। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাব প্রকাশ করতে প্রস্তুত। এই ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের কাছে তা মুখরোচক হয় না। মানুষমাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় ও বিলয় হয়। এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কারোর উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি নিজেকে বীণা ছিলেন দেখবেন না, দেখবেন বাদক হিসেবে। পরের মনোবীণার বাদক হতে হলে লেখকদের কনের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হতে হবে। ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্য পরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা বচ্ছন্ন রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হলে, অব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যক এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহ মনকে বাহ্য জগত ও অর্জগতের নিয়মাধীন করা।

১৩.৫ আলোচনা

বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটির নাম ‘বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ’ হলেও, প্রবন্ধটিকে নবযুগের লেখকদের প্রতি উপদেশ বলে বর্ণনা করা চলে। বর্তমান যুগকে কেন প্রমথ চৌধুরী নবযুগ বলেছেন সেকথা বলে নিয়ে এবং এই নবযুগের দু' একটি লক্ষণমাত্র বর্ণনা করেই তিনি নবযুগের বঙ্গসাহিত্যে লেখকদের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন। লেখক এই নবযুগের প্রথম লক্ষণটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে। সত্যিই এ যুগে বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে রাজা-মহারাজা বলে কেউ নেই কিন্তু প্রবন্ধ রচনাকাল তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের রাজাসনেই বিরাজ করেছিলেন। যাই হোক বর্তমান যুগ যে , বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের নয়, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের একথা সত্য। কারণ এযুগে সাহিত্য মাসিকপত্রবাহন। মাসিকপত্র যথাসময়ে বার করাই। প্রধান, যা বেরল তার মূল্য নির্ণয় করা অনাবশ্যক। শুধু যে মাসিক পত্রের প্রাচুই এ যুগের একটি লক্ষণ তাই নয় এ যুগে প্রাধান্য লাভ করেছে সচিত্র. মাসিকপত্র। এই প্রসঙ্গে চৌধুরী মশায় চিত্রবিদ্যাবিষয়ক কিছু আলোচনাও করেছেন। তিনি বলেছেন আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। তাই কবির ঘোড়া জীবন্ত ঘোড়ার মত নাও হতে পারে। সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্রবিষয়ক আলোচনা তিনি করেছেন এই জন্য যে এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ এবং যা চিত্রকলার দোষ বলে গণ্য তাই আজকাল এ দেশে কাব্যকলার গুণ বলে মান্য। এ যুগের লেখকরা মনে করেন বাস্তবিকা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়। এই মনোভাবকে তিনি। সমালোচনা করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী শুধু এ যুগের সাহিত্যের লক্ষণ ও গুণ বর্ণনা করেছেন তাই নয় এর দোষের কথাও তিনি বলেছেন। এযুগের সাহিত্য গণধর্ম অবলম্বন করেছে এবং গণধর্মের প্রধান ঝোক হচ্ছে বৈশ ধর্মের দিকে। তার ফলে যেন-তেন প্রকারে বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটানোর ব্যগ্রতায় সাহিত্য-ধর্মের, সাহিত্যের উৎকর্ষের বিচ্যুতি ঘটেছে এই বলে তিনি সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছেন। সাহিত্য যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চিত্র সাহায্যে নয়, আপন মর্যাদায় যে তা দাঁড়াতে পারে, লোভের চেয়ে

দারিদ্রের মর্যাদা যে সাহিত্যে অধিক এক প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধে ঘোষণা করেছেন। এর পরে তিনি বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। মনে যে ভাব উদয় হচ্ছে তাই যে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হবে এই প্রবৃত্তি দমন করতে হবে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন অনেকখানি ভাব মরে একটু ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহীলোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। তার মতে কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয় ভাব উদ্রেক করা। তাই লেখকের প্রতি তার উপদেশ যে কবি নিজেকে বীণা হিসেবে দেখবেন না, দেখবেন বীণাবাদক হিসেবে এবং সে বীণাও পরের মনোবীণা। এই কথাটির একটু বিচার প্রয়োজন। পাঠকের মনে ভাব উদ্রেক করাই যে কাব্য রচয়িতার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠকে মনে ভাব উদ্রেক করতে হলে কবিকে ভাব প্রকাশ করতে হবে বইকি। প্রমথ চৌধুরীর কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা হয় এই উক্তিটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া বোধ হয় যায় না। সম্ভবত তিনি এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে পাঠকের মনে ভাব উদ্রেকের উদ্দেশ্য নিয়ে কবিকে তার নিজের কাব্যে ভাব প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ যে কাব্য পাঠকের মনে করি ভালকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে না পারলে তা কাব্য হিসেবে ব্যর্থ। একথা অবশ্যই সত্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ পরের মানের বাণার বাদক রূপে সাফল্যলাভ করবার জন্য কবিদের বস্তু রায়ের ও কলার নিনের একান্ত শাসনাধীন হতে হবে অর্থাৎ অবলীলাক্রমে রচনা করতে হবে, অবহেলাক্রমে নয়। তার মতে উপযুক্ত সাধনা করতে হবে এবং সেই সাধনা করার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহ-মনকে দাহ্য ও অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। এর অর্থ পরিষ্কার নয়। যে কোন ব্যক্তির দেহ বাহ্য জগতের নিয়মাবনি, একই সকলেরই জানা। এই সর্বনান তথ্যটি প্রমথ চৌধুরী এত জোরের সঙ্গে শোনালেন কোদেহের কথা বাদ দিন মনের কথাই ধরা যাক। মনকে বাহ্য জগৎ ও অংগতের নিয়মাধান করার অর্থ বোধহয় এই যে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্গতের সকল নিয়মকানুন সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকা, বিদ্যাচর্চার দ্বারা সেই নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, লেখকের বিচারবুদ্ধি থাকতে হবে, তাকে সতর্ক সাধনায় মগ্ন হতে হবে তবেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জন করবেন। অর্থাৎ স্বভাবকবিত্ব নয়, সাধনার

দ্বারা অর্জিত কবিত্বশক্তিই প্রমথ চৌধুরীর কাছে আদরণীয়, যে কবিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি স্বয়ং।

১৩.৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে কেন?

নব্য সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয়ে যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মার, তাহলে যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হবে।

২। নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে কী অবলম্বন করেছে?

নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।

৩। সাহিত্য রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন কখন?

অতীত অন্যদেশের মতো এদেশের সাহিত্য জগৎ ও দু-চারজন লেখকের দখলে ছিল, লেখা দূরে নাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না। সেইসময় সাহিত্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন।

৪। কাব্য সাহিত্যে তারা কি রেখে গেছেন? তারা কাব্য, ইতিহাস, দর্শনের ক্ষেত্রে, মন্দির অট্টালিকা স্তুপ প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

৫। এর জন্য আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই কেন?

কারণ বস্তু জগতের ন্যায় সাহিত্য জগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য নয়।

৬। পুরাকালে মানুষে যা কিছু গড়ে গেছে তার উদ্দেশ্য কী?

পুরকালে মানুষ যা গড়ে গেছে তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সমাজ থেকে আলগা করা, দু-চারজনকে বহু লোক থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

৭। নবযুগের ধর্ম কী?

নবযুগের ধর্ম হল মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা। সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ করা।

৮। কোন লেখকের দিন আসছে?

বহু শক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্প শক্তিশাল সংখ্যক লেখকের দিন আসছে।

৯। সকলকে কী বিষয়ে লিখতে হয়?

আমাদের সকলকে সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতো শেলায় থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই আমাদের সমান অধিকার ভুক্ত।

১০। আমাদের হাতে কী জন্মলাভ করে?

আমাদের হাতে কেবল ছোটোগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

১১। লেখকরা কোন সত্য মনে রাখলে গল্প-স্বল্প হয়ে আসবে?

একালে গল্প স্বল্প আয়তনের, তার উপর লেখাটি ফাপ। তাই গ্রহণীয়তা কম। বালা গালা ভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। এই সত্যের কথা বলা হয়েছে।

১২। সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে কেন?

গণধর্মের প্রধান কোক হচ্ছে বৈষধর্মের দিকে, এবং সেই ঝোকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠে।

১৩। সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে কেন?

সাহিত্যে বাজারদর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে তার মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞান তত লোপ পাবে।

১৪। এখন মাসিক পত্র সকল কেমন হয়ে উঠছে?

এখন মাসিক পত্র সকল সচিত্র হয়ে উঠেছে।

১৫। ছবির প্রতি গণসমাজে নারীর টান কীভাবে বোঝা যায় ?

নারীর টান যে আছে তার বড় প্রমাণ মার্কিন সিগারেট। চিত্রের সাহচর্যে অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্ছে।

১৬। সাহিত্যের অবণতি হবে সন্দেহ নেই কেন?

পত্রিকায় ছেলে ভুলানো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার উন্নতি বিষয়ে সন্দেহ আছে। সমাজে গোলাম পাশ করে দেওয়াতেই বণিক বুদ্ধির সার্থকতা এজন্যই। অবণতি হবে।

১৭। সংসারে নিয়ম কী, সাহিত্য তা খাটে?

একজন যা করে অপরে তার দোষ, গুণ বিচার করে, সংসারের নিয়ম এটাই। ইবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য।

১৮। চিত্রকলার সমালোচনা কবে থেকে শুরু হয়েছে?

যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে তার পরদিন থেকেই তার অনুকুল এবং প্রতিকুল সমালোচনা শুরু হয়েছে।

১৯। আর্টের ধর্ম কি?

প্রকৃতির বিকতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কাব্য নয়— কিন্তু তাদের আকৃতি দেওয়াটাই আর্টের ধর্ম।।

২০। শিল্পীরা কোন শাসন মানতে বাধ্য ?

শিল্পীরা জ্যামিতি কিম্বা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয় কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য।

২১। চিত্রে আমরা কি দেখতে চাই?

চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাই নে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই

২২। সত্যভ্রষ্ট হলে কি হয় না?

সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না আর্টও হয় না। বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর।।

২৩। অস্থিবিদ্যা কিসের উপর নির্ভর করে?

কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক জ্ঞানের উপর নয়।

২৪। চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি?

এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য।

২৫। আলোচ্য বিষয় সাহিত্য, চিত্র নয়—আলোচনা করো।

এ যুগের সাহিত্য চিত্রসমান হয়ে ওঠায় চিত্রকলার বিষয় উল্লেখে বাধ্য হয়েছেন প্রাবন্ধিক। তিনি দেখিয়েছেন, যা চিত্রকলার দোষ বলে গণ্য তাই আজকাল এদেশে কাব্যকলার গুণ বলে মান্য।

২৬। এযুগের লেখকের বিশ্বাস কি?

এ যুগের লেখকের বিশ্বাস, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তুর আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্যমান।

২৭। সর্বলোক বিদিত সহজ সত্য কি?

যার ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয় কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

২৮। কবিত্বশক্তি কি?

প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তাোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি।

২৯। মহাকবি ভাস কি বলেছেন?

'সনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্যয়' করা অন্ধকারের ধর্ম। সাহিত্যে ওরাপ করা প্রতিভার পরিচয় দেওয়া যায় না।

৩০। প্রতিভার ধর্ম কি?

প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা-প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়।

৩১। পূর্বপুরুষরা বাহ্যজগতের কোন খোঁজ রাখতেন না কেন?

এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে পূর্বপুরুষরা বাহ্যজগতের কোনাে গো রাখতেন না।

৩২। পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না কেন?

অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারো পক্ষে পরবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না। কেননা, বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়।

৩৩। আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ কেন?

মানসিক আলস্যবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্ণ।

৩৪। আমরা কথায় ছবি আঁকতে পারি নে কেন ?

তার একমাত্র কারণ হল, আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

৩৫। ভারতবর্ষের দৈন্য ঘোচাতে কি করা দরকার?

আমাদের মনে যে সব চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তা এতই অপূর্ব এবং মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারত বর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না।

৩৬। সাহিত্যের সকল অনর্থের মূল কি?

ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যের সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩৭। রচনাশক্তি কি?

মানুষ মাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়। এই অস্থির ভাবকে ভাষায় হির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি।

৩৮। নব্য লেখকদের প্রতি প্রাবন্ধিকের উপদেশ কি?

তারা যেন দেশী বিলাতি কোনোরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক অন্তত নিজের উপকার করা হবে।

১৩.৭ জয়দেব

প্রমথ চৌধুরী তার জয়দেব প্রবন্ধে বলেছেন একখানি সাহিত্য গ্রন্থকে দু রকম ভাবে আলোচনা করা যায।প্রথমত কাব্যে রূপে দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের উপায় রূপে ।প্রথম পথ অবলম্বন করলে আমরা কেবল তার দেশকাল নিরপেক্ষ হিসেবে বিচার করতে পারি ।দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করলে আমরা তা যে নির্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হয়েছিল সেই দেশের তখনকার অবস্থা সকল আলোচনার দ্বারা তার সেই সম্বন্ধীয় কাব্য সকলের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ,কোন কোন বিশেষ কারণ জনিত এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি ।সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য আলোচনা সাধন করে মাত্র কিন্তু এই পদ্ধতির সাহায্যে যথার্থ সমালোচনা করা যাযনা। তিনি স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে এরমধ্যে না থাকায় শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ এর কি সম্মন্ধ তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। একইসঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে লেখক এর পরিমিত জ্ঞান অনুসারে জয়দেবের সময়ে অর্থাৎ বঙ্গীয় রাজা লক্ষণ সেন এর সময় বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধতে লেখক জয়দেবের গ্রন্থ কেবলমাত্র কাব্য হিসেবে বিচার করে

ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে। তিনি বলেছেন তিনি শুনতে পান গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয় নাকি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। "আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্বিকতার কোন পরিচয় নাই। তাহার কাব্যে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাই বুঝিয়াছি। কোন নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবন ও করিতে পারিনাই।"

প্রাবন্ধিকের কাছে কৃষ্ণ রাধা আমাদেরই মত রক্ত মাংস গঠিত মানুষ এবং তাদের প্রেম কেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলেই তিনি মনে করেছেন ।যদি যথার্থ একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যটিতে প্রাণ পায় তাহলে প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধের যা বলছেন তা একান্তই অর্থশূন্য হবে। সূচনাস্বরূপ এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করে প্রমথ চৌধুরী আসল বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়নমূলক দু চারটি ঘটনা নিয়ে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন। একদিন কৃষ্ণ গোপিনীদের সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করছিলেন ।এমন সময় রাধা বেশভূষা করে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উক্ত ব্যাপার দেখে ক্রোধভরে ভ্রু-কুঞ্চিত করে চলে গেলেন। কৃষ্ণ একান্ত অপ্রতিভ হয়ে মনোভাব ধারণ করে থাকলেন এবং রাধাকে গমন থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা মাত্র করতেও সাহসী হলেন না। কিন্তু রাধা চলে গেলে দেখে তিনি গোপ বধুদেরকে পরিত্যাগ করে কোন এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় নিয়ে মনের দুঃখে রাধার কথা ভাবতে লাগলেন ।এদিকে রাধা নিজের স্থানে ফিরে এসে কৃষ্ণ কৃত পূর্ব বিহার স্মরণে উদ্দীপ্ত হয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আসার জন্য তার নিকট সখী প্রেরণ করলেন ।বললেন "আমি যাইতে পারবোনা তাহাকে আসিতে বলো। তারপর সখীর রাধার কাছে প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের নিকট পাঠাবার চেষ্টা ।কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও জনিত ক্লান্তির কারনে স্থান ত্যাগ করতে অসমর্থ হয় অগত্যা আবার কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসে কৃষ্ণ আর রাধার স্বয়ং যেতে রাজি হয় রাধাকে সুসংবাদ জানালে রাধা কৃষ্ণের আগমন প্রতিজ্ঞা করতে থাকে কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখতে পারেন না ।কাজেই রাধা মনে করেন কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর সঙ্গে থেকেছেন। উক্ত রমণীর সঙ্গে কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার

করছেন। এই সকল কথা কল্পনা অনুভব করে সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করে বিলাপ করতে থাকেন। রাত্রি এভাবে কেটে যায়। সকালে কৃষ্ণ রাধার সম্মুখে উপস্থিত হয় ।রাধা-কৃষ্ণকে কি ভাষায় সম্ভাষণ করলেন তা বোধহয় বলার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণ নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন না।"অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দুর এসকল কথা হইতে আসিল না হয় একটি বাজে কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে কিন্তু পরিধানের নীল শাড়ি সম্বন্ধে মিথ্যা কৈফিয়ত খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জয় মান করিয়া বসলেন কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি রাধার প্রীতি সাধন করিলেন রাধাকৃষ্ণের করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল।"

এটা হল সকলের ঘটনা ।যোগাযোগে সেই দিনটি ও কেটে গেল। দিনের শেষে রাধা কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। উভয়ের মিলন হল ।মিলন এর পর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তরে কৃষ্ণের দ্বারা রাধার কেশ বিন্যস্ত হয়।এর সঙ্গে গ্রন্থ শেষ হলো।

দেখা যাচ্ছে কাব্যের মুখ্য বিষয় রাধা কৃষ্ণের রূপ। তাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখ প্রকাশ, মিলিত হলে পরস্পরের কথোপকথন অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাদের মনোভাব এর বর্ণনা আনুষঙ্গিক রূপে যমুনাতীর কুঞ্জ বন বসন্তকালে রাধার সুখী ও অন্যান্য গোপিনীদের কথা বলা হয়েছে।গ্রন্থ শুরুতে গ্রন্থাকারের আত্মপরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায় রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ছাড়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এর অন্য কোন বিষয় কোনরূপ ধর্ম ও নৈতিক বা নৈতিক মতামত কিছুই গীতগোবিন্দের স্থান পায়নি। এটা প্রাবন্ধিকের কাছে অত্যন্ত সুখের বিষয় বলে মনে হয়েছে ।কারন কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় তার কল্পনা তত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের সমালোচনা করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাবন্ধিক এখন জয়দেবে যা নেই তার কথা ছেড়ে দিয়ে,তাতে যা আছে তার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।জয়দেবের কবিত্ব শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করার আগে প্রমথ চৌধুরী তাঁর বর্ণিত প্রেম কি রূপ ও তার বন্ধুরা কিরকম তা আলোচনা করেছেন।

মনের ভাব প্রকাশ করা যায় কথায় ও কাজে সাধারণ গোপীগণ রাধা ও কৃষ্ণ এরা

প্রেম শব্দের অর্থ কি বোঝেন তা তাদের কথায় ও কাজে বিশেষরূপে বোঝা যায়।গোপীনীরা কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে, কানে কানে কথা বলার ছলে তার মুখ চুম্বন করে তাকে আলিঙ্গন করে 'কেলিকলাকুতুকেন' কুঞ্জ বনে প্রবেশের জন্য তার পরিহিত ধরে আকর্ষণ করে তার প্রতি স্বীয় প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। রাধা কৃষ্ণের বিরহ কাতর হয়ে সুখি কে বললেন

সখী হে কেশিমথ নমুদারম

রময়ময়াসহ মদন মনোরথ ভাবিতয়া সবিকরম

তারপর কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হলে কৃষ্ণ কি করবেন এবং তার অবস্থা কেমন হবে রাধা সে বিষয়ে সখিকে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটি ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সভায় সভাসদেরকে পড়ে শোনাতে পারেননি প্রমথনাথ। নিজেরা পড়ে দেখলেই তাতে রাধা বিরহ মিলন কিভাবে দেখেন তা অতি স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সখী কৃষ্ণের কাছে রাধাবিরহ অবস্থা জেনে বলেছেন রাধা

ব্রতমিব তব পরি রম্ভ সুখায় করতি কুসুম শয়নীয়ম।

আরো নানা কথা বললেন ফলে বুঝা গেল রাধার অবস্থাও শোচনীয়।তিনি অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ রক্ষা পাওয়া ভার রোগের কারণ কৃষ্ণ বিরহ গতি কঠিন হলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তার প্রমাণ হতে পারে। কৃষ্ণ কথা এবং ব্যবহারে তার মনোভাব নিঃসন্দেহে রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কেবল মাত্র চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি দ্বারা গোপিনীদের প্রতি তাঁর অন্তরের ভালোবাসা প্রকাশ করেন ।সখী দ্বারা কৃষ্ণ খবর পাঠান শ্রীমতিকে । কৃষ্ণ রাধার দুর্জয় মান ভাঙার জন্য সকল সুবচন প্রয়োগ করেন।তাতে ওই একটি ভাবই ফুটে ওঠে।রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যেভাবে মত্ত সে ভাবের নাম সংস্কৃত ঠিক প্রেম নয় । জয়েদেবের বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি আকাঙ্ক্ষা থেকে। তার পরিণতি দেহের মিলনে। তার উদ্দেশ্য দেহের ভোগ জনিত সুখ লাভ। তার কাছে বিরহের অর্থ প্রণয়ী প্রণয়ইনি জনিত শারীরিক কষ্ট । গীতগোবিন্দ তে ধরতে গেলে প্রেমের কথা নেই ।কেবলমাত্র কামের বিষয় আলোচিত হয়েছে ।হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।শরীর নিয়েই তার কারবার ।যে রমণীর মনে প্রেম নেই ,যার হৃদয়

নেই ,কেবলমাত্র দেহ আছে তার স্ত্রী সুলভ নম্রতা লজ্জা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের অভাব থাকার কথা ।যুবতীরা নির্লজ্জতার পরিচয় তাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছে।রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে স্মর শর পর বশা কুত প্রিয় মুখ দেখে নির্লজ্জভাবে উচ্চ হাস্য করে ওঠেন।

এই প্রেমের কথার পর আসে শারীরিক সৌন্দর্যের কথা। শারীরিক সৌন্দর্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও আকৃতি, বর্ণ এবং ভাব অর্থাৎ আন্তরিক সৌন্দর্যের বিকাশ।

জয়দেবের নায়ক-নায়িকা যখন সর্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্যের বঞ্চিত তখন অবশ্য তাদের শারীরিকভাবে সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিমাণ সামঞ্জস্য ও বর্ণ এসকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হলেও দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলে এতে কোন ভোগের ভাব মিশে থাকে না। যে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায় তার কেবল মানসিক উপভোগ সম্ভব। তাতে যে সুখ লাভ করা যায় তা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ, তাতে দেহের কোনরূপ লাভ-লোকসান নেই। কিন্তু স্পর্শ করে যে সুখ তা চৌদ্দ আনা দৈহিক। সুতরাং জয়দেবের কাছে আমরা আকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতার অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদেরকে নিরাশ করেন না।

এছাড়াও প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে জয়দেবের রচনা দোষ গুণ বিচার করেছেন।কোন একটি বিশেষ রচনা কাব্য কিনা ,যদি কাব্য হয় তাহলে কাব্যাংশ শ্রেষ্ঠ বাণী কিনা এসকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে আগে কাব্য কাকে বলে সেই বিষয়ে কিছু পরিমাণ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা সকলেই সচরাচর কবিতা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকি এবং আমাদের সকলেরই মনে কাব্য কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণা আছে ।সেটি যে কি তা ঠিক করে প্রকাশ করে বলা অত্যন্ত কঠিন কোন একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভেতর পৃথিবীর যাবতীয় কবিতা প্রবেশ করানো সম্ভব নয় ।কোন কাব্যের সমস্ত গুণ এর বর্ণনা করা অসম্ভব ।কিন্তু সকল কাব্যের মধ্যে সাধারণ অংশ তা নির্ণয় করতে পারলে তা যে কি সে বিষয়ে একটা সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী

বিবেচনায় আমাদের দেশে প্রচলিত কাব্যের সংজ্ঞার ভেতরের অংশ অর্থাৎ যার অভাবে কোন রচনার কাব্য হতে পারে না সেটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কাব্য রসাত্মক বাক্য সংজ্ঞায় কাব্যের প্রকৃত অর্থ বোঝানো হয়েছে।এই অল্প সংখ্যক কথার মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তা খুলে বুঝিয়ে দিলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন সকল পাঠকের পক্ষে তা অনুভব করা সম্ভব।

বাক্যের বিষয়ে মানুষের মনোভাব ।বাক্যের উদ্দেশ্য তা প্রকাশ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে শব্দ ।বাক্য রসাত্মক হতে হলে প্রথমত ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক ।তৃতীয়তঃ এভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য যাতে রসাত্মক শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হতে পারে ।শব্দের রস কি? অবশ্যই মধুরতা ।যেমন সংগীতের সুর।প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইলে যত শুনতে ভালো লাগে ছন্দ ব্যতিরেকে ততদূর মিষ্টি লাগে না। সুতরাং কবির ভাষা ছন্দ যুক্ত ।দুটি উপকরণ পদ্যে থাকে। Rhyme এবং rhythm. এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টি ছন্দের প্রাণ। রাইম না থাকলেও ছন্দ হয় কিন্তু রিদিম না থাকলে চলে না। ইঁদুরের সম্ভব বর্তমান থাকলে ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ অবয়ব নেয়। কবির কাব্যে যত রাইম এবং রীদিম থাকবে ততই তার শব্দের রস বেশি হবে।

যে ভাব মনে সুন্দরভাবে জাগায় আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ আনন্দ দেয় তাই রসাত্মক ভাব।যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তর মূর্তি ,পূর্ণিমা রজনী ইত্যাদির কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন।আবার তিনি চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য কথা বলেছেন। দর্শন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা লোকের মানসিক তৃপ্তি সাধন তার কাজ। কিন্তু তিনি তার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে ভাবে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন।আবার তিনি এটিও বলেছেন কবির পক্ষে কোনো একটি বিষয়ে কাব্য যুক্ত করতে হলে প্রথমে তাকে ভাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে লিপ্ত করতে হবে এবং তারপর তাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে।

নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আমি ভাষা ও ভাব পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতরে কোন প্রভেদ নাই।"তিনি আরো বলেছেন ভাব মন্দ হলে কবিতার ভাষা কখনো সুন্দর হতে পারে না

এবং ভাষা কদর্য হলে ভাব ও সম্পূর্ণরূপে কবিত্ব পূর্ণ হতে পারেনা ।কবিতার ভাষা ভাবের দেহের মত। কিছুতেই তা ভাব থেকে পৃথক করা যায় না ।একটি ভাষায় ব্যক্ত হলেও অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হয়ে যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালীদাস বলেছেন 'সূচিভেদ্য স্তমস ' জয়দেব বলেছেন' অন অল্প তিমির 'এর মধ্যে কতটা প্রভেদ সেটা সকল সহৃদয় পাঠক বুঝতে পারে।যে অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা কবিতার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাই কবিতার আত্মা। আত্মা আমাদের আত্মার মতোই রহস্য জড়িত।যেমন বৈজ্ঞানিকরা মানবদেহে খণ্ড খণ্ড করে তাহার ভেতরকার আত্মাকে খুঁজে পান না, তেমনি সমালোচকরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন উপাদান সকল পরস্পর হতে সৃষ্ট করলেও তাদের অন্তর আত্মাকে ধরতে পারেন না।কিন্তু তিনি এও বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব সবকে পরিপাটি ছন্দ ভাষা যুক্ত করেন তাহলেও তার রচনা কাব্য শ্রেণীভূক্ত নয়।সৃষ্টি ও নির্মাণের যে পার্থক্য কবিতা ও তার অনুকরণে রচিত প্রাণশূণ্য ছন্দোবদ্ধ সমষ্টিতে সেই প্রভেদ রয়েছে।

জয়দেব অধিকাংশ কবিদের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেছেন।প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতায় বর্ণিত বিষয় করেছেন তিনি। এজন্য আমরা তাকে কালীদাসী কবিগণের সঙ্গে এরপর প্রাবন্ধিক জয়দেব কিভাবে কাব্য করে নিজের কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেছেন। জয়দেবের কবিতাগুলির প্রকৃতির শোভা রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তার বিরহ মিলন বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ।কবি প্রধানত দুই প্রণালীতে বর্ণনা করে থাকে ।প্রথমত স্পষ্ট এবং সহজভাবে ।দ্বিতীয়তঃ বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন ।শ্রেষ্ঠ কবিরা দুই পন্থাই ব্যবহার করে থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথম প্রথা অবলম্বন করেছিলেন। বর্ণনার সৌন্দর্য উপমা অলংকার শব্দে প্রয়োগ করেছিলেন জয়দেব।এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যে একটা মিল আছে। আমাদের সময় সময় কোন একটি পদার্থ অথবা ঘটনা দেখে মনে হয় যেন অন্য একটি জিনিস কে একইভাবে আমরা দেখেছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতর সাদৃশ্য তুলনা থেকে উপমা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন উপমার দ্বারা দুই কার্য সিদ্ধ হয় ।এর দ্বারা

একটি অস্পষ্ট ভাবে স্পষ্ট করা যায় আবার এর দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া কোন দুটি ভাব বা পদার্থের ভেতর আমরা অলক্ষিত অনুরূপ মিল আনন্দ লাভ করে থাকি। কবিতা যে সকল উপমা ব্যবহার করা হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য কোন একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং কেবলমাত্র উপমার যথার্থ দ্বারা মনের তুষ্টি সাধন ।সুতরাং জয়দেবের কবিত্ব যথার্থ এবং সৌন্দর্য্যের উপমা অলংকার প্রয়োগের শক্তি সাপেক্ষে বিচার্য।

জয়দেবের বিরহ বর্ণনা একঘেয়ে ।তার বিরহ বর্ণনা সুখপাঠ্য নয়। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য কোন অংশ ধরতে পারেনি। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষ স্ত্রীর বিরহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব রয়েছে। বিরহ অবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তার উল্লেখের অভাব রয়েছে জয়দেবের কাব্যে।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনা কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনা দেখা যায় বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেছেন। তাতে "অভিসারিকার মনের আবেগ নিমিত্ত অবলম্বন করে এসকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই।"তাই এই বর্ণনা একঘেয়ে তার বসন্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাতে একটি অসম্পূর্ণ নতুন কথা দেখা যায়না ।পূর্ববর্তী কবিরা যেসকল বসন্ত বর্ণনা লিখেছিলেন সেগুলি প্রতিফলন এখানে দেখা যায়। নতুনত্বের কথা ছেড়ে দিলেও তাতে আরও অনেক দোষ বেরিয়ে আসে। তার সমস্ত বর্ণনাটিকে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটে ওঠে না ।তিনি যে কথা বলেন তার ভেতর থেকে কোন বিশেষ ভাবে দেখা যায়না। কালিদাস অনেক স্থানে বসন্ত বর্ণনা করেছেন ।তার অনেক স্থানেই তিনি একটি মাত্র শ্লোকে বসন্তের পূর্ণ বর্ণনা প্রকাশ করেছেন ।একটি মাত্র চিত্রে সমগ্র বসন্তকে আবদ্ধ করেছেন।কিন্তু জয়দেব বসন্ত বর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে ভাবের কোন মিল নেই ।তিনি একটি শ্লোক এর প্রথম চরণে বলেছেন যে "বসন্তে বিরহিগণ বিলাপ করিতেছেন " এই শ্লোকে অন্য একটি চরণে তিনি বললেন "অলিকুল কর্তৃক বকুলকলাপ অধিকারে"এর কথা উল্লেখ করেছেন। জয়দেবের উদ্দেশ্য ছিল বসন্তে মদন রাজার অধিকার বিস্তৃত হয়েছে তা বর্ণনা করা। কিন্তু কেবলমাত্র কোন ফুলকে মদন রাজার নখ বা অপর একটি হৃদয়বিদারক

বিরহিদের কথা বললেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তা হয়তো তিনি বুঝতে পারেননি। জয়দেবের উপমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন "তার উপমা সকল প্রায় নেহাত পড়ে পাওয়া গোছের।"জয়দেব এর আগে বহুবার এই একই উপমা বহু কবি ব্যবহার করেছেন। জয়দেবের অনেক স্থানে পরের উপমা বদলিয়ে নিজের বলে চালাবার চেষ্টা প্রমথ চৌধুরী খুঁজে পেয়েছেন। তবে পরিকল্পিত কয়েকটি নতুন উপমায় গীতগোবিন্দে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো কয়েকটি প্রমথ চৌধুরী ' জয়দেবিয় ' বলে মনে করেছেন। জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে বলে তিনি ' জয়দেব ' প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। এর ভাষা সুললিত এবং শ্রুতিমধুর এটি সর্বজন বিদিত। এমনকি যারা সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ তারাও একথা স্বীকার করে থাকেন ।কবিতার ভাষার সৌন্দর্য থেকে ভাবে সৌন্দর্য কে পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না তারা লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য হয় ভাব বিষয়ে পণ্ডিতি নয় ভাষা বিষয়ে ছন্দ নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু জয়দেবের ক্ষেত্রে কাব্য সুগঠিত। তবে প্রমথ চৌধুরী সমালোচক হিসেবে বলেছেন " যাহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানব দেহের সৌন্দর্য যাহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানব দেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলে মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান যাহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা কৃত্রিমতা অধিক - এককথায় যাহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,তাহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি।"এরপর পাঠকের ওপর প্রমথ চৌধুরীর ভরসা রেখে এবং তাদেরকে জয়দেব সম্পর্কে মত নির্ধারণ করার দিকটি উন্মুক্ত রেখে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। তবে তিনি মনে করেন রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বৈষ্ণব কবিতা আমাদের সামনে অনেক সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।

১৩.৮ অনুশীলনী

১। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্থান নির্ণয় করো।

২। বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী কি বলতে চাইছেন বিস্তারিত আলোচনা কর।

৩। জয়দেব প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তার সাহায্যে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ সংগ্রহ- প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ পাঠ ও বিশ্লেষণ- ভুটান চন্দ্র ঘোষ ,অরুন কুমার পাল

একক ১৪ - সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা এবং বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি

বিন্যাসক্রম

১৪.১ সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা

১৪.২ সংক্ষিপ্তসার

১৪.৩ ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় তার মূল্য

১৪.৪ ‘রচনার প্রধান গুণ এবং প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা।’

১৪.৫ 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন

১৪.৬ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পক্ষে এবং বিপক্ষে লেখক যেসব যুক্তি রেখেছেন।

১৪.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১৪.৮ বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি

১৪.৯ অনুশীলনী

১৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১ সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা

'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধটি ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

প্রমথ চৌধুরীর সতীর্থ শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু ও চলিত ভাষার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধের শুরুতেই প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে আমরা "Standard Prose", হিসাবে দেখি", প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন।

ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"যে সকল বিদেশী শব্দ বেমালুম বঙ্গ ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সকল বস্তু অবশ্য কথার মতো লেখাতেও নিত্যব্যবহার্য হওয়া উচিত" এই মতের পক্ষপাতী প্রমথ চৌধুরী, প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে ভাষা শব্দ ত্রিবিধ-তজ্ঞ, তৎসম, দেশ্য। বঙ্গভাষার তজা ও তৎসব শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশজ শব্দের সংখ্যা অল্প এবং বিদেশী শব্দ অতি সামান্য।

ললিতবাবু সাধুভাষার সপক্ষে দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন (১) সাধুভাষা আর্টের অনুকূল (২) চলিত ভাষা অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানী মারাঠী গুরাজটি প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোকেদের কাছে অধিক সহজবোধ্য। প্রমথ চৌধুরী সাধু ভাষার মধ্যে আর্টের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ লেখক কোন যুক্তি দেখাতে না পারলে আর্টের দোহাই দেয়। কিন্তু লেখকের মতে সাধু ভাষায় কোন আর্ট দরকার নেই। সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার উভয় সংকটের রূপটি দেখিয়েছেন। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর আর্য আক্রমণ রয়েছে। তার উপর স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর মুসলমান আক্রমণের প্রস্তাব ভয়ঙ্কর। অপরিচিত ও আগ্রাহ্য বিদেশি শব্দকে বাংলা সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে নষ্ট করে ভাষা করে তাকে কদর্য ও বিকৃত করে ফেলা হয়। এটাই। ইল উভয় সংকট। এই উভয় সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় আছে। বাংলা ভাষা থেকে বাংলা শব্দ সকল বহিস্কৃত করে দিয়ে অর্থেক সংস্কৃতি এবং অর্ফেক আরবি পারসি শব্দ দিয়ে স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলে

দুই দিক রক্ষা। প্রমথ চৌধুরী চলিত গদ্য ভাষাকেই। বারবার সমর্থন করেছেন, ভাষা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান বক্তব্য হল ভাষার রূপটিকে রাখতে হবে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য ও সুবোধ্য। ক্রিষাবাদের এবং সর্বনামের সাপ আমাদের স্বাভাবিক বাগভঙ্গি নয় বলে তা বর্জন করাই সমুচিত। আলালি ভাষা যদিও স্থানে স্থানে সুরুচি সঙ্গত থাকতে পারেনি তবু সেই ভাষারই পরিশুদ্ধ রূপ লেখা চলিত ভাষা হয়ে জঠবে বলে তিনি মনে করেন। বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগভঙ্গির অনুসরণ করে, শিক্ষিত বাঙ্গালির নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারের শব্দগুলিকে বিশুদ্ধ অন্বয় বিন্যস্ত করে, চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাহায্যে গ্রহণযোগ্য লেখ্য চলিত ভাষা গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন। সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী ভাষা সমীক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অন্যতম।

১৪.২ সংক্ষিপ্তসার

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি আমার হস্তগত হয়েছে। লেখক আমার সতীর্থ, বোধহয় সেই কারণে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের শুধু নামের মিল নয়, মতামতেরও মিল আছে। যেমন ললিতবাবু, সাধু ভাষার লেখকরা বাধ্য হয়ে চলিত শব্দ ব্যবহার করলে। সেটা যে উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে লেখেন, এর প্রতিবাদ করেছেন। বাংলা কথাকে সাহিত্য সমাজে জাতিচ্যুত করার বিষয়ে পূর্বপ্রবন্ধে আমি যা বলেছি তাতে দেখা যাবে যে আমরা উভয়েই মাতৃভাষার উপর এরূপ অত্যাচারের বিরোধী। তবে তার সঙ্গে আমার প্রধান তফাত এই যে তিনি সাধুভাষার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি বলার আছে। তা একত্র করে গুছিয়ে পাঠকের চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছেন কিন্তু কোনোরূপ মীমাংসা করে দেননি। তিনি দেখাতে চান সমস্যাটা কি, আমি দেখাতে চাই মীমাংসাটা কি হওয়া উচিত। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিষয়টির আলোচনা করতে চান। আমি একটা বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করেছি।

ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে সাধুভাষার সপক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন-

১। সাধুভাষা আর্টের অনুকুল।

২। চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।

এদেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে যুক্তি যখন কোনো দাঁড়াবার স্থান পায় না, তখন আর্ট প্রভৃতি বড় বড় কথার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা' (বঙ্কিমচন্দ্র, "বাঙ্গলা ভাষা", বিবিধ প্রবন্ধ।)—লেখায় সেই গুণটি আনবার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্টহীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হন না। দ্বিতীয় যুক্তিটি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে সম্বন্ধে কোনোরূপ উত্তর করতেই প্রবৃত্তি হয় না। যারা আমাদের ভাষা জানেন না তারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ্য করে তুলতে হবে; কথাটা এতই অদ্ভুত যে এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। যদি কারও এরূপ ভাবনা থাকে যে উক্ত উপায়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হইবার পথ প্রশস্ত হইবে, কালে ভারতের সর্বত্র এক ভাষা হইবে" তাহলে সে ধারণা নিতান্ত অমুলক। ভাবতবর্ষে ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকার ধারণ করুক না কেন, একাকার হয়ে যাবে না।

ললিতবাবু পণ্ডিতি বাংলার উপর বিশেষ নারাজ। আমিও সেরকম রচনা-পদ্ধতির, পক্ষপাতী নই। তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত লেখকদের সপক্ষে এই কথা বলবার আছে যে তার সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে ব্যবহার করেননি। প্রবোধচন্দ্রিকা কিংবা পুরুষপরীক্ষা পড়লে আমরা বাংলা না শিখতে পারি কিন্তু সংস্কৃত ভুলে যাইনে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সুপণ্ডিত ও সুরসিক, তার গল্প বলার ক্ষমতা অসাধারণ। পুরুষপরীক্ষার ভাষা নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং স্রোতস্বতী। রাজা রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের লেখার দোষ ধরা সহজ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এরাই বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম গদ্যলেখক। বাংলা গদ্যের রচনা-পদ্ধতি এদেরই উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তাদের মুশকিল হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয়, অন্বয় নিয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে

standard prose, তার কারণ তিনিই প্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্যাদা তার সংস্কৃতবহুলতার উপর নয়, তার syntax-এর উপর নির্ভর করে।

এইসব কারণেই পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বঙ্গভাষার কোন ক্ষতি করেননি বরং অনেক উপকার করেছেন। সর্বনেশে ভাষা হচ্ছে চন্দ্রাহত সাহিত্যিকরা ইংরেজিবাক্য ও পদকে যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাষা। সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে। মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং 'আলালি' ভাষাকে আমাদের শোধন করে নিতে হবে।

আমাদের রচনায় কতদূর পর্যন্ত আরবি পারসি ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দের ব্যবহার সংগত, সে বিষয়ে ললিতবাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণ করায় কোনো লাভ নেই। যেসকল বিদেশি শব্দ বেমালুম বঙ্গভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে, সে সকল শব্দ অবশ্যকথার মত লেখাতেও নিত্য ব্যবহার্য হওয়া উচিত। আমি এবিষয়ে ললিতবাবুর মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখা কর্তব্য—বঙ্গভাষা বাঙালি হিন্দুর ভাষা; এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে গৌড়ীয় ভাষা প্রায় বর্তমান আকারে গঠিত হয়ে উঠে ছিল। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষা শব্দ ত্রিবিধ—তজ্জ, তৎসম ও দেশ্য। বঙ্গভাষার তজ্জ, তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য। সুতরাং জোর করে যদি আমরা বাংলাভাষায় এমন-সব আরবি কিম্বা বা পারসি শব্দ ঢোকাতে চেষ্টা করি, যা ইতিপূর্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি, তাহলে ঐরূপ উপায়ে আমরা বঙ্গ ভাষাকে শুধু বিকৃত করে ফেলব। সম্প্রতি বাংলাভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করবার প্রস্তাব হয়েছে বলে এবিষয়ে আমি বাঙালী মাত্রকেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।

আলোচনা ও আলোচ্য 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। ললিতবাবুর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের খুব যে

একটা পার্থক্য আছে, তা নয়। তথাপি তার রচিত প্রবন্ধটিকে অবলম্বন করে প্রমথ চৌধুরী সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন, যেসব মতামত এর পুর্বে বহুবার তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় প্রকাশ করেছিলেন। তাদের উভয়ের মতামতের যে অনেকটা মিল আছে প্রমথ চৌধুরী ললিতবাবুর প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তার প্রবন্ধের প্রথমাংশেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। তারপর তিনি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথাও বিশ্লেষণ করেছেন। ললিতবাবুর মনের ঝোঁক যদিও আসলে বঙ্গভাষার দিকে তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন কারণ তিনি নিরপেক্ষভাবে সমস্যাটা কি, সাধু ভাষার সপক্ষে বা বিপক্ষে কি কি বলার আছে তাই দেখতে চেয়েছেন, কোনো মীমাংসা করে দিতে চান নি, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী নিরপেক্ষ থাকতে চান না কারণ তিনি বিশেষ একটি পক্ষের সমর্থক। তিনি বলেন যে, যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের যে, কোন একটা দিক অবলম্বন করতেই হবে। তিনি চলিত ভাষার পক্ষে সাধু ভাষার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। কিন্তু পূর্বপক্ষের অর্থাৎ সাধুভাষার সপক্ষে যারা আছেন তাদের বক্তব্য প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে সাধুভাষার পক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। প্রমথবাবু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপসহ সে যুক্তিগুলি খুব সহজেই খণ্ডন করেছেন। এর পর এসেছে পণ্ডিতি বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা। ললিতবাবু পণ্ডিতি বাংলার উপর বিশেষ নারাজ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বলেন ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা বঙ্গভাষার কোন ক্ষতি করেন নি বরং অনেক উপকার করেছেন। তারা সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে ব্যবহার করেননি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের রচনাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। শব্দ নিয়ে নয়, তারা মুশকিলে পড়েছিলেন অন্বয় নিয়ে। অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এইসব কারণে পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ঝগড়া নেই। তিনি আসল সর্বনেশে ভাষা মনে করেন সেই ভাষাকে যা চন্দ্রাহত সাহিত্যিকরা ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমন করে অনুবাদ করে সৃষ্টি করেছেন। প্রমথ চৌধুরী এই ভাষাকে খিচুড়িভাষা নাম দিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে তার মতে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সুতরাং আমাদের, 'আলালি' ভাষাকে শোধন করে নিতে হবে। সেবিষয়ে এখানে প্রমথ চৌধুরী কোনো আলোচনা করেননি। পণ্ডিতি বাংলার বিকার যে বাবু-বাংলা, প্রমথ চৌধুরীর মতে, তার কোনো সংস্কার সম্ভব নয়। বাবু-বাংলা বলতে তিনি সাধু ভাষাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা এই রকম ক'টি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যদিও, কেন তিনি সাধু ভাষাকে বাবু-বাংলা বলেন, সেখানে তা ব্যাখ্যা করেননি।

এরপর প্রমথ চৌধুরী আলোচনা করেছেন বাংলাভাষায় বিদেশি শব্দের দান সম্বন্ধে। আরবি, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা বিদেশী ভাষার বহুসংখ্যক শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে ও করছে। সব ভাষাতেই এরকম হয়। ললিতবাবু একে প্রাকৃতিক নিয়ম বলেছেন এবং লেখাতেও এইসব শব্দ ব্যবহার করায় তার সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, এক্ষেত্রে তার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের ঐক্য আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব আরবি পারসি শব্দ আমাদের ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি সেইসব নূতন আরবি বা পারসি শব্দ এখন বাংলাভাষায় ঢোকাতে চেষ্টা করা হলে, প্রমথ চৌধুরীর মতে, তার দ্বারা বঙ্গ ভাষাকে বিকৃত করে ফেলা হবে। সম্প্রতি ঢাকা-ইউনির্ভাসিটির রিপোর্টে এইরকম একটা প্রস্তাব করা হয়ছে বলেই, প্রমথ চৌধুরী বাঙালি মাত্রকেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই কারণ আমরাও অপরিচিত ও অগ্রাহ্য বিদেশি শব্দকে জোর করে বাংলাভাষায় ঢুকিয়ে তার বিশেষত্ব নষ্ট করে, কদর্য ও বিকৃতি করে ফেলার বিরোধী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি আমরা অনৈতিহাসিক ও সমর্থনের অযোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলছেন—"বঙ্গভাষা বাঙালি হিন্দুর ভাষা; এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্বে গৌড়ীয় ভাষা প্রায় বর্তমান আকারে গঠিত হয়ে উঠেছিল।" একথা সত্য নয়। বঙ্গাভাষা বাঙালির অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা। এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই। তার আগেকার বঙ্গসাহিত্য কিইবা ছিল। তারপরই মধ্যযুগের বিশাল বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার বিভিন্ন কবির দানে পুষ্ট হতে থাকে। এইসব কবির মধ্যে অল্পসংখ্যক হলেও মুসলমানরাও ছিলেন। বঙ্গভাষা শুধু হিন্দুর ভাষা

হলে এত অধিক পরিমাণ আরবি, পারসি শব্দ সে ভাষায় প্রবেশ করতে পারতো না। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর এই মতটি আমরা সমর্থন করতে পারি না। অন্যথায় প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং এর সব মতই সমর্থনীয়। প্রবন্ধের একেবারে শেষ বাক্যটি প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসুলভ রসিকতার ভঙ্গিতে অপূর্ব্ব। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপেরও অভাব নেই।

১৪.৩ 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় তার মূল্য

'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী রচনা করেছিলেন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ একই নামের একটি প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে। সুতরাং সাধু ভাষার বিপক্ষে অথবা চলিত ভাষার সপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব সকল মতামত এখানে প্রকাশিত হয় নি। তিনি এই প্রবন্ধে চলিত ভাষার প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাধু ভাষার যাঁরা পক্ষপাতী তাদের বক্তব্য ও যুক্ত সাধারণত এক জায়গায় পাওয়া যায় না বলেই সেই সব যুক্তি খণ্ডন করার সুযোগ একটা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর সেই সুযোগ ঘটেছে। কারণ ললিত তার প্রবন্ধে সাধু ভাষার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া যেতে পারে সেগুলি একত্রে সংকলিত করে দিয়েছেন। যদিও ললিতবাবুর মনের ঝোঁক চলিত ভাষারই দিকে তথাপি তিনি তার প্রবন্ধে নিরপেক্ষভাবে সমস্যাটা কি তাই দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য অন্যরূপ। তিনি বলেন যে সবদিক রক্ষা করে চলবার উদ্দেশ্য ও অর্থ হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। সামাজিক জীবনে আমাদের নিত্যই সে কাজ করতে হয়। কিন্তু কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোনো একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে, আমাদের সব যত্ন-চেষ্টা এবং পরিশ্রম নিরর্থক হয়। যে মত আমরা দেশের বা জাতির কল্যাণের জন্য সমর্থনযোগ্য মনে করি সে মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে। তাই, যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের কোনো একটা দিক অবলম্বন

করতেই হবে। কেননা একসঙ্গে দুদিকে চলা অসম্ভব। তাছাড়া যখন দুটি পথের মধ্যে কোনটি ঠিক পথ, এ সমস্যা একবার উপস্থিত হয়েছে তখন যে পথকে আমরা ঠিক বলে বুঝেছি সেই পথের সমর্থনে আমাদের অগ্রসর হতেই হবে। তাই প্রমথ চৌধুরী দৃঢ়তার সঙ্গে চলিত ভাষার সমর্থন করতে অগ্রসর হয়েছেন।

ভূমিকাস্বরূপ এই কথাগুলি বলে নিয়ে প্রমথ চৌধুরী, সাধু ভাষার সপক্ষে যে দুটি যুক্তি ললিতবাবু উপস্থিত হয়েছেন, সেই মুক্তি দুটিকে খণ্ডন করেছেন। ললিতবাবুর প্রথম মুক্তি এই যে সাধুভাষা আর্টের অনুকুল। এ বিষয়ে চৌধুরী মশায় বলেছেন এ দেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, যুক্তি যখন কোনো দাঁড়াবার স্থান পায় না, তখন আর্ট প্রভৃতি বড় বড় কথার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তথাকথিত সাধু ভাষার সম্বন্ধে তার প্রধান আপত্তি এই যে ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে ‘বাঙ্গলাভাষা’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা'। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে লেখার সেই গুণটি অর্থাৎ সরলতা এবং স্পষ্টতা, আনার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্টহীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হন না। প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি খুব স্পষ্ট নয়। বোধ হয় তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে নিজের মনোভাব সরল ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই রচনার প্রধান গুণ এবং সেটি করতে পারাই আর্ট। চলিত ভাষাতেই মনোভাব সরল ও স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যায় কাজেই চলতি ভাষাই, সাধু ভাষার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আর্টের অনুকূল। ললিতবাবুর সাধু ভাষার সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা, হিন্দুস্থান, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজসাধ্য। প্রমথ চৌধুরী এই যুক্তিকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন। তার বহু পূর্বে রচিত একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে প্রমথ চৌধুরী এই যুক্তির উত্তর দিয়েছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন যে যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ করে তুলতে হবে, কথাটা সত্যই অদ্ভুত। কাল বাংলাভাষা বাঙালির

কাছে কিভাবে সরল সহজ সুবোধ হতে পারে আমাদের চেষ্টা তাই হওয়া উচিত। তার বদলে অবাঙালি যাতে বাংলা ভাষা সহজে বুঝতে পারেন তার জন্য বাংলাভাষাকে সংস্কৃত করে তোলার পক্ষে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। তবে এমন কথা যে বলা হয় তার কারণ কারো কারো এরকম ধারণা আছে যে এই উপায়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হবার পথ প্রশস্ত হবে। ফলে ভারতের সর্বত্রই এক ভাষা হবে, কিন্তু এই ধারণাকেও প্রমথ চৌধুরী অমুলক বলেছেন। তার মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, একাকার হয়ে যাবে না। রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করেও সকলকে এক যোগসুত্রে বন্ধন করা। প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধ রচনার দীর্ঘকাল পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বিষয়ে তার দৃষ্টি কত স্বচ্ছ এবং যুক্তি কত খাঁটি ছিল। এইভাবে তিনি, সাধুভাষার সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাকে খণ্ডন করেছেন।

এরপরে প্রমথ চৌধুরী পণ্ডিতিবাংলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের রচিত সাংস্কৃতবহুল ভাষার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তার সঙ্গে এই পণ্ডিতি বাংলার কোন ঝগড়া। নেই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, হরপ্রসাদ রায়, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষার তিনি পক্ষপাতী। এঁদের ভাষারও তিনি প্রশংসা করেছেন, কারণ একমাত্র অন্বয়ের ত্রুটি ছাড়া এদের ভাষার আর কোন দোষ নেই। অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। তার মতে আসল সর্বনেশে ভাষা হচ্ছে ‘চন্দ্রাহত সাহিত্যিক’রা ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়িভাষার সৃষ্টি করেছেন সেই ভাষা। এই ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তার নেই, এই হচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর মত। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ‘আলালি’ ভাষাকে শোধন করে নিতে চান।

এরপর প্রমথ চৌধুরী আলোচনা করেছেন বাংলাভাষার মধ্যে আরবি, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দের ব্যবহার কতদূর সংগত। এ বিষয়ে ললিতবাবু ও তিনি একমত। যেসব বিদেশি শব্দ প্রাকৃতিক নিয়মে বাংলাভাষায় প্রবেশ করে বেমালুম এই ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সেসব শব্দ আমাদের কথার মত লেখায়ও নিত্যব্যবহার্য হওয়া

উচিত। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে শব্দ ত্রিবিধ—তজ্জ, তৎসম, দেশ। বঙ্গ ভাষায় তজ্জ (অর্থাৎ তদ্ভব) এবং তৎসম (অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান) শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য (অর্থাৎ দেশি) শব্দের সংখ্যা অল্প এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য। কিন্তু আরবি, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দের সংখ্যা বাংলাভাষায় তদ্ভব ও তৎসম শব্দের চেয়ে কম হলেও অতি সামান্য নয়। সে যাই হোক এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী ফরাসী ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। কারণ ল্যাটিন ভাষার কাছে ফরাসী ভাষার যে সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষারই সে সম্বন্ধ। ফলে ফরাসী সাহিত্যের যা বিশেষ গুণ, বাংলা সাহিত্যেরও সেইগুণ থাকা সম্ভব ও উচিত। সুতরাং ইতিপুর্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি, এমন-সব আরবি, পারসি শব্দ যদি আমরা জোর করে বাঙলা ভাষায় ঢোকাতে চেষ্টা করি তাহলে বাংলাভাষাকে বিকৃত করা হবে। সম্প্রতি এইরকম একটা প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। সুপরিচিত বাংলা (ভব, তৎসম বা দেশি) শব্দের বদলে যদি নুতন অপরিচিত ও অগ্রাহ্য আরবি, পারসি শব্দ জোর করে বাংলাভাষায় ঢোকানো হয় তাহলে বাংলাভাষার বিশেষত্ব নষ্ট হবে। প্রমথ চৌধুরী রসিকতা করে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাংলাভাষা থেকে বাংলা শব্দসকল বাদ দিয়ে অর্ধেক সংস্কৃত অর্ধেক আরবি-পারসি শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে দুকুল রক্ষে হয়। এমন কথা বলবার কারণ একদল হিন্দু যেমন বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে চান, একদল তেমনই তদ্ভব তৎসম শব্দগুলি দুর করে তার বদলে পারসি শব্দ ব্যবহার করতে চান।

যাই হোক, উপযুক্ত আলোচনা থেকে প্রমথ চৌধুরীর মূল বক্তব্য শুয়ে নিতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি সাধু ভাষার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখতে চাননি। ভাষার বহুল পরিমাণে দেশি বা চলিত শব্দ প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী। বাংলাভাষার রীতি অনুসারে সঠিক অনয় বজায় রেখে রচনা করলে, সংস্কৃত শব্দ সঠিক অর্থে প্রয়োগ করলে ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হয় বলেই তার ধারণা। যেসব বিদেশি শব্দ বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, সেগুলি তিনি বাংলা রূপেই গণ্য ও ব্যবহার করতে চান কিন্তু নূতন ও অপরিচিত বিদেশি শব্দ নূতন করে জোর করে, প্রচলিত বাংলা

শব্দের বদলে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী। তার সমস্ত মতামতই সমর্থনযোগ্য এবং এই পথেই বাংলাগদ্য উন্নতি লাভ করতে পারে বলে তাঁর মতোই আমাদের বিশ্বাস।

১৪.৪ ‘রচনার প্রধান গুণ এবং প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা।’

উত্তরঃ প্রমথ চৌধুরী ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধে সাধু ভাষার সহিত । তুলনায় চলিত ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সাধু ভাষা আর্টের অনুকুল অর্থাৎ উপযোগী ভাষা এবং চলিত ভাষা অপেক্ষা তা হিন্দুস্থানী, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিগণের কাছে অধিক সহজবোধ্য বলে সাধু ভাষার অনুকুলে প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধবাদিরা যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছেন, তিনি এই প্রবন্ধে তা অতি নৈপুণ্য-সহকারে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী ‘সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধের একাংশে লিখেছেন—

তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, এরকম কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। এ স্থলে এটুকু বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা”—লেখায় সেই গুণ আনার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্টহীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হন না।'

নীরস বিষয়াশ্রিত এবংবিধ বিতর্কমূলক প্রবন্ধও প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণাগ্র বাচ্চাতুর্য ও স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতায় সরস, প্রোজ্জল ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ধর্ম ও নীতি প্রসঙ্গেও প্রমথ চৌধুরী কয়েকটা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ‘সাহিত্যে খেলা', সাহিত্যে চারুক’, ‘খেয়াল খাতা’, ‘কাব্যে অশ্লীলতা— আলংকারিক মত', 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে খেলা’ নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি-ধর্ম বা নিছক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রচারের বিরোধিতা করিয়াছেন। সাহিত্য-শিল্প যে বিশুদ্ধ আনন্দধর্মী এবং ইহা যে সাহিত্যস্রষ্টার প্রসন্ন মনের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ, এই প্রবন্ধে

তিনি তাহাই বিবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্য খেলা' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। এই কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।

সাহিত্যের ধর্ম বা রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর যে বক্তব্য তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা তাঁর চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবত্বের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কেবলমাত্র বীরবলী পরিবেশন-কৌশলের চমৎকারিত্বে বহুল প্রচলিত সাহিত্য-মীমাংসা, সমন্বিত রচনাও পাঠোপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

১৪.৫ 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন

সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাবা প্রবন্ধটি রচনার মূল উৎস হল ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা নামক একটি পুস্তিকা। ললিত আমার ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর সতীর্থ। তিনি সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোন বিচারমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি, সাধু ভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাঁরা যা বলেছেন ললিত কুমার সেগুলিকে একসঙ্গে গুছিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন মাত্র। কোনটা ভালো বা কোনটা মন্দ সেরকম বিচারে বা মীমাংসায় তিনি যাননি। এমনকি দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টাকে তিনি আবশ্যক বলে মনে করেননি। প্রমথ চৌধুরী সেইখানেই তাঁর নতুন করে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে ললিত কুমারের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজের মতামতের অনেক মিল আছে। কিন্তু ললিত

কুমার যেখানে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যকার সমস্যাটা দেখিয়েই থেমে গেছেন প্রমথ চৌধুরী সেখানে উকিলের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ এক পক্ষের হয়ে নিজস্ব মতামতকে প্রকাশ করেছেন। সমস্যার জালে আটকে না থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বিচারকের ভূমিকায় যেন বসেছেন। নির্দিষ্ট একটা রায় দিতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা শ্রেয় মনে করেছেন তার জন্যই তিনি এরকম স্পষ্ট রায় দানকে কর্তব্য বলে গণ্য করেছেন। সে কারণে শুধু নিজের মতকে প্রচার করে ক্ষান্ত থাকেননি সে মতের অনুসারে বাংলাভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছেন।

ললিত কুমার একটা জিনিসের এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠ দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু প্রমথ চৌধুরী দুপিটে কোনটা সোজা আর কোনটা উল্টো তা বলে দিয়েছেন। কারণ তাঁর মত হল কি জীবনে কি সাহিত্যে কোন একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে আমাদের যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম সবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই মানসিকতায় কোন বিশেষ মতের বা পক্ষের হয়ে বক্তব্য প্রকাশে বরাবর সচেষ্ট থেকেছেন প্রাবন্ধিক। সাহিত্যে লেখার জন্য একটা বিশেষ রীতির চলন যে আবশ্যক সেটা অনুভব করেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচনায় হাত দিয়েছেন লেখক। ললিত কুমার সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা দুদিককেই রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী সেই চলাকে অসম্ভব জ্ঞান করে দুটি পথের মধ্যে কোন পথটি ঠিক তা স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন। সাহিত্যসেবী আর অহিফেন সেবীকে তিনি এক শ্রেণীর জীব বলে মানেননি। সাহিত্য সেবীর স্পষ্ট বক্তা হওয়া দরকার। নিজে সাহিত্য সেবী বলে আলোচ্য প্রবন্ধে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে কোন ভাষার পক্ষ অবলম্বন করা উচিত প্রমথ চৌধুরী স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। ললিত কুমারের মত আধা ডিগ্রী ও আধা ডিসমিস দলের পক্ষপাতী নন। এইখানেই ললিত কুমারের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতার তফাত ঘটে গেছে। বর্তমান প্রাবন্ধিক স্পষ্ট করেই চলিত ভাষার পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেছেন।

চলিত ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার প্রথম যে বাধা অনুভব করেছেন তা হল তার সময়ের বাংলা সাহিত্যে প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে থাকা সাধুভাষা। একটা জিনিস প্রচলিত থাকলে তার বিপক্ষে মত প্রকাশ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যা

চলে আসছে তার দিকেই মানুষের ঝোক থাকে বেশি। লেখক বলেছেন, সাধারণ লোকের এইটাই বিশ্বাস যে প্রচলিত আচার-ব্যবহারকে মন দিয়ে সাজিয়ে নেওয়াতে বিপদ আছে। সমাজ সম্বন্ধে এই মতের কতকটা সার্থকতা থাকলেও সাহিত্য সম্বন্ধে মোটেই নেই বলে লেখক তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ লেখার ভেতর মানবমনের পরিচয় প্রকাশ পেলেই তা সাহিত্য হয়। ললিত কুমার অনেক অনুসন্ধান করে সাধুভাষার সপক্ষে যে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন প্রমথ চৌধুরী সেই দুটি যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন। ললিত কুমারের যুক্তি দুটি হল—

(i) সাধুভাষা আর্টের অনুকূল (ii) চলিত ভাষার চেনো সাধুভাষা অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের কাছে বেশি সহজবোধ্য । প্রবন্ধকার বিরুদ্ধ যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে আমাদের দেশে যুক্তি যখন কোন দাঁড়াবার জায়গা পায়না তখনই দেখা যায় যে আর্ট প্রভৃতি বড় বড় কথার আড়ালে তা আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে। সে বিষয়ে কারো কোন স্পষ্ট ধারণা নেই সেই বিষয়ে বক্তৃতা করা অনেক নিরাপদ। তাতে সত্যটা সহজে ধরা পড়েনা। তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের প্রধান আপত্তি এই যে ও ভাষা পুরোপুরি কৃত্রিম তাই ওর মধ্যে আর্টের কোন স্থান নেই। তার মত হল রচনার প্রধান গুণ আর প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে লেখক আর্টহীন তিনি তার নিজের মনোভাব কখনোই লেখায় সফলভাবে প্রকাশ করতে পারেন না।

ললিত কুমারের দ্বিতীয় যুক্তিটিকে প্রবন্ধকার খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেছেন। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী ভারতী পত্রিকায় তাঁর পূর্ব প্রকাশিত ‘কথার কথা’ প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। সে প্রবন্ধে মজা করে তিনি লিখেছিলেন যে কারো কারো নাকি বিশ্বাস বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে আসামী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বাংলা ভাষা শেখাটা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এ নিয়ে আমাদের দেশের ছোট ছেলেদেরও একটা বিশ্বাস আছে যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলে সংস্কৃত ভাষা হয়ে যায়। আর বড়দের বিশ্বাস আছে যে সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ হেঁটে দিলে বাংলাভাষা হয়। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলে কি মানুষ হয় ? সমর্থনের ছলে লেখক এ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গই করেছেন।

তার মত হল যারা আমাদের ভাষা মানেন না তাদের ভাষা বোঝানোর জন্য আমাদের ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলাটা সঙ্গত নয়। এর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হতে পারে না। ভারতের বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ভাব, আচার এবং আকার তাদের বিশেষত্ব হারিয়ে এক জাতি হয়ে উঠবে এমন আশা যারা করে তারা কাঁঠাল গাছকে আমগাছ হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেন। লেখকের মত হল ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন নানাজাতির বিশেষত্ব রক্ষা করেও এক যোগসুত্রে তাদের বন্ধন। তাই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রবন্ধকার তার স্বাস্থ্যের প্রকাশই চেয়েছেন।

ললিত কুমার পণ্ডিতি বাংলার ওপর বিশেষ নারাজ। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু সেরকম রচনা পদ্ধতি পক্ষপাতী নন। প্রশান্ত পণ্ডিত লেখকরা সংস্কৃত শব্দের মিষ্ট প্রয়োগ না ঘটলেও দুষ্ট প্রয়োগ ঘটাননি। তাদের লেখা পড়লে আমরা বাংলা শিখি না বটে, তবে সংস্কৃত ভুলে যাই না। লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী। কেননা তিনি সুপণ্ডিত ও সুরসিক গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। মৃত্যুঞ্জয়ের ‘প্রবোধ চন্দ্রিকা’র পূর্বভাগের ভাষা কঠিন হলেও শুদ্ধ নয়। যার ক্ষমতা আছে তিনি তার থেকে রসাস্বাদ পেতে পারেন। আমাদের নব্য লেখকরা মন দিয়ে ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ পড়লে অনেক সদুপদেশ লাভ করতে পারবেন বলে প্রবন্ধকার জানিয়েছেন। তাঁর মতে রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখার দোষ ধরা সহজ হলেও এরাই যে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গদ্য লেখক সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। বাংলা গদ্যের রচনা পদ্ধতি এদেরই আবিষ্কার। এদের মুশকিল হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয় অন্বয় নিয়ে। রামমোহন, তাঁর রচনার পাঠ করতে গেলে পাঠককে কি উপায় তাঁর অন্বয় করতে হবে তার হিসেব বলে দিয়েছেন। রামমোহনের গদ্য অদ্ভুত লাগার প্রধান কারণ, তার বিচার পদ্ধতি ও তর্কের রীতি পুরোপুরি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের মত। আমরা সে পদ্ধতিতে এখন গদ্য লিখিনি। ইংরেজি গদ্যের সহজ গতি অনুকরণের চেষ্টা করি। রামমোহনের গদ্য আড়ম্বর পূর্ণ নয় সমাস বদ্ধ নয় এবং সংস্কৃত বহুল নয়।

প্রাবন্ধিকের মতে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল আদর্শ গদ্য রচনা করেন। তার ভাষার মর্যাদা সংস্কৃত বহুলতার উপর নির্ভরশীল নয়। তা নির্ভরশীল ভাষার গঠন ভঙ্গি র

(Syntax) ওপর। অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগরের ভাষা সুখপাঠ্য হয়েছে তাই পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে প্রাবন্ধিকের কোন ঝগড়া নেই। বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। করেননি বরং অনেক উপকার করেছেন। আর নতুন লেখকরা যখন সে ভাষার অনুকরণ করছেন না, তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী যেতে চাননি বরং সে সব চন্দ্রাহিত সাহিত্যিকরা ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমনভাবে অনুবাদ করে যে জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি করেছেন তাতেই বাংলা ভাষার সর্বনাশ হচ্ছে। সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে আঁতুড়েই বাংলা সাহিত্যের মৃত্যু ঘটবে। সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতেই প্রবন্ধকার মৌখিক ভাষার আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। আলালি ভাষাকে শোধন করতে চেয়েছেন। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে যে সাধুভাষা যুক্ত আছে তাকে প্রবন্ধকার বলেছেন টিনের গরুর দুধ। সেই টিনের গরুর দুধ খেয়ে যারা বড়ো হয় মাতৃদুগ্ধ তাদের কাছে মুখরোচক ঠেকে না।

ললিত কুমার মন্তব্য করেছেন যে প্রাকৃতিক নিয়মে বাংলা ভাবায় যথাক্রমে আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার প্রবেশ ঘটেছে। প্রবন্ধকার ললিতবাবুর এই মতের পক্ষপাতী হয়েও একটা কথা মনে রাখতে বলেছেন যে, বাংলা ভাষা বাঙ্গালি হিন্দুর ভাষা। এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রাদুর্ভাবের অনেক আগেই বাংলা ভাষার ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বলেছেন, অন্যান্য দেশীয় ভাষার থেকে গৌড় দেশীয় ভাষা উত্তম। লেখকের মতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভালার সম্বন্ধ অন্য ঘনিষ্ঠ ।

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ ভাষার তিনটে প্রকার রূপে তজ্জু, তৎসম ও দেশ্য-র নাম উল্লেখ করেছেন। বাংলা ভাষায় দু'প্রকার শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প আর বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি অল্প। ল্যাটিন থেকে যেমন ফরাসি ভাষা এসেছে তেমনি সংকেত থেকে বাংলাভাষারও একই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। জোর করে বাংলা ভাষায় আরবি, পার্সি শব্দ ঢোকানো অনুচিত বলে মনে করেছেন। অপরিচিত ও অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে জোর করে সাহিত্যে ঢোকালে ভাষা বিকৃতি দেখা দেবেই তা থেকে উদ্ধার পাবার সহজ উপায়ের কথাই জানতে গিয়েই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, বাংলা ভাষা থেকে বাংলা শব্দগুলিকে বের করে দিয়ে অর্ধেক সংস্কৃত আর অর্ধেক আর পারসি

ভাষা দিয়ে স্কুলপাঠ্য বই লিখলে দুকুল রক্ষে হয়। এটি অবশ্য লেখকের রসিকতাময় উক্তি।

১৪.৬ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পক্ষে এবং বিপক্ষে লেখক যেসব যুক্তি রেখেছেন।

সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা প্রবন্ধে যুক্তিবাদী মননশীল প্রাবন্ধিতার সতীর্থ ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের বিষয়কে সামনে রেখে প্রবন্ধের মুখবন্ধ করেছেন। ললিত বাবু চলিত ভাষার পক্ষে, কিছুটা সওয়াল করে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধুচলিতের সমস্যাকে দেখিয়েছেন। প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে এই সমস্যার মীমাংসা করতে চেয়েছেন। ললিতবাবু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে চেয়েছেন যদিও বিচারকের আসনে তিনি বসতে চান নি। অপরদিকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে যা শ্রেয় তার জন্য ওকালতি করতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। লেখার একটা বিশেষ রীতি অবলম্বন । করতে গিয়েই, সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষার প্রসঙ্গটি এসেছে। প্রাবন্ধিক মনে করেন ললিত বাবুর মতে সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা এই মামলা মীমাংসা করতে গেলে আধা ডিগ্রী তাকি ডিসমিস ছাড়া উপায় নেই। প্রাবন্ধিক এই মতে বিশ্বাসী নন। তিনি মনে করেন সাধুভাষির বাংলাসাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রটাই দখল করে বসে আছে, আজ সময় এসেছে, চলিত ভাষার পক্ষে সেই দখল হয়ে যাওয়া সম্পতির পুনরুদ্ধার করার।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষাকে রাজ প্রাসাদের সুয়োরানীর আর চলিতভাষাকে দুয়োরানী বলেছেন। তিনি চলিত ভাষার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন অনেক বাঙালি তার মাতৃভাষাকে ইতরভাষা বলে মনে করত। তারা মন করেছেন বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা করা নীচের উচ্চ ভাষা স্বরূপ। ললিত বাবু বই অনুসন্ধান করে সাধুভাষার পক্ষে দুটি যুক্তি, আবিষ্কার করেছেন। এক সাধুভাষা আর্য এর অনুকুল, দুই চলিতভাষা অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি মারাঠি গুজরাটি প্রভৃতি

ভিন্নজাতীয় লোকেদের কাছে বেশি সহজবোদ্ধ, সাধুভাষার পক্ষে আর্যের বেদোহাই দেওয়া হয়েছে প্রাবন্ধিক তা মানতে রাজি নন। তিনি মনে করেন সাধুভাষার যতো কৃত্রিম ভাষায় আর্যের কোন স্থান নেই। যেটা প্রয়োজন তা হল সরলতা ও স্পষ্টতা। দ্বিতীয় যুক্তি হল বাংলাকে প্রায়ই সংস্কৃত করে আনলে অসমীয়া হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকেদের পক্ষে বাংলা ভাষা শেখা সহজ হবে, অথবা বাংলাভাষার বাঙালিত্ব নষ্ট হবে। একথা যারা বলে তারা, বাংলা ভাষার স্বরূপ প্রবণতার লক্ষণ কিছুই বোঝে না। সাধুভাষার দ্বারা বাংলাভাষাকে শুধু দুর্বোদ্ধ করে তোলা হয়। অথচ বাংলা ভাষাকে সাধারণ লোকের কাছাকাছি আনতে হলে চলিত ভাষার একান্ত প্রয়োজন। তাতে বাংলা সাহিত্য শ্রীহীন না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

ললিতবাবু পণ্ডিতি বাংলার উপর বিশেষ নারাজ, লেখক কিন্তু তা নন। পণ্ডিতি বাংলা লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো যেসব বাঙালি তাদের লেখা পড়লে বাংলা শিখতে না পারলেও সংস্কৃত শিখতে পারা যায়। এবং সেই সব লেখার মধ্যে সরসতা আছে অন্ততঃ বাইরের আড়ম্বর নেই। লেখক লিখেছেন রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার দোষ ধরা সহজ কিন্তু আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে এরাই হচ্ছে বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম গদ্যলেখক। এঁরা বাংলা গদ্যের উদ্ভাবক, তবে তার শব্দ যেন ও অন্বয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা সংস্কৃতি অনুসারী হয়ে পড়েছেন এবং বাংলা গদ্যের সহজ সাবলীলতা একটু ব্যহত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে স্ট্যাণ্ডার প্রোজ (Stander prose) হিসাবে দেখি তার কারণ তিনি সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্যাদা তার সংস্কৃত বহুলতার উপর নয় তার সিনটেক্স (syntex) এর উপর নির্ভর করে। অন্বয়ের গুণে বিদ্যাসাগরের ভাষা রামমোহনের তুলনায় সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে প্রাবন্ধিকের কোন বিবাদ নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বঙ্গভাষার ক্ষতি না করে উপকার করেছেন। বঙ্গভাষার ক্ষতি করেছে তারা যারা চন্দ্রাহত সাহিত্যিক। ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করেছেন সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য আঁতুড়েই মারা যাবে।

আর/এবং সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ন্তর নেই। সুতরাং আলালি ভাষাকে আমাদের শোধন করে নিতে হবে। বাবু বাংলার কোন রূপে সংস্কার করা অসম্ভব। কারণ সে ভাষা হচ্ছে পণ্ডিতি বাংলার বিকার মাত্র। দুধ একবার কেটে গেলে তা আর কোন কাজে লাগে না। লেখক ললিতবাবুর মত 'কঠোর অস্থি পাঁঞ্জর-পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির বায়ুশূন্য টিনের কোঠার রক্ষিতা' । এই মতকে সমর্থন করতে পারেননি। কারণ স্কুলপাঠ্য বইয়ের মধ্যে সাধুভাষার যেরূপ থাকে, তা টিনের দুধ। সেই দুধ যারা খায়, মাতৃদুগ্ধ তাদের ভালো লাগে না। অথচ টিনের মধ্যে রক্ষিত দুধের কোন পুষ্টি নেই। মাতৃদুগ্ধ মৌখিক বা চলিত বাংলা আর টিনের সুখাদ্য মুগ্ধ সাধু বাংলা। ললিতবাবুর মতো—বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি-ফার্সি এবং ইংরাজিও প্রবেশ করেছে। এখানে স্বাভাবিক নিয়মও ঘটেছে। এবং বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। ললিতবাবু এই মতকে অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন লেখক। কিন্তু মনে রাখতে হবে বঙ্গভাষা বাঙালি হিন্দুর 'ভাষা। তাই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডারে যদি বিদেশী শব্দের পরিমাণও বেশি হয়ে যায়, তবে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের নিজস্বতা ও ভারসাম্য রক্ষিত হবে না। বঙ্গভাষার মধ্যে তজ্জু, তৎসম এবং দেশ্য শব্দের সংখ্যা বেশি, এবং দেশ ও বিদেশী শব্দের সংখ্যা সামান্য বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। এবিষয়ে ফরাসি ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার মিল আছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। তার মতে ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার যে সম্পর্ক সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গ ভাষার সেই সম্পর্ক। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার যে সম্পর্ক সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার সেই সম্পর্ক। ফরাসি সাহিত্য যে বিশেষ গুণ বঙ্গসাহিত্যেরও এই গুণ থাকা উচিত।

সুতরাং বাংলাভাষার মধ্যে আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটালে বঙ্গভাষার সক্রিয়তা শুধু নষ্ট হবে না, বঙ্গভাষা বিকৃত হয়ে পড়বে। সেইজন্য লেখক প্রত্যেক বাঙালিকে সতর্ক করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঢাকা চাপা রিপোর্টে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন। কারণ তজ্জু শব্দকে রূপান্তরিত বহর তৎসম শব্দ করলেও বাংলা ভাষার ধর্ম নষ্ট হয় না। কিন্তু পরিচিত অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে জোর করে বাংলা

ভাষায় প্রবেশ করিয়ে দিলে বাংলা ভাষাকে শুধু বিকৃত করা হয় না বাংলা ভাষার প্রাণ বিনিষ্ট ঘটে। মুসলমান শব্দের আক্রমণে তাই অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রাবন্ধিক বলে উপায় আছে বাংলাভাষা থেকে বাংলা শব্দ সকল বহিঃস্কৃত করে দিয়ে অধিক সংস্কৃত এবং অধিক আরবি, ফার্সি দিয়ে স্কুল পাঠ্য রচনা করলে দুকুল রক্ষা হয়।

সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ললিতবাবুর মতামতকে সামনে রেখে কখনও তার মতকে সমর্থন করেছেন, কখনও তার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। নিরপেক্ষ ভাবে এবং যুক্তির নিরিমে তিনি যেমন সাধু বাংলার পরিবর্তে চলিত ভাষা। এবং মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে ভাষা হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন, তেমনি পণ্ডিতি বাংলাকে সমর্থন করে আরবি, ফারসি, ইংরাজি' মিশালে জগাখিচুড়ি কৃত্রিম বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

১৪.৭সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক গ্রন্থটির লেখক কে? প্রমথ চৌধুরীর সতীর্থ শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম. এ গ্রন্থটির লেখক।

২। ললিতবাবু কি দেখাতে চান? তিনি দেখাতে চান যে, তার মনের ঝোক আসলে বঙ্গভাষার দিকে, তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন।

৩। আমরা সামাজিক জীবনে কি করে থাকি?

সবদিক রক্ষা করে চলবার উদ্দেশ্য এবং অর্থ হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। আমরা সামাজিক জীবনে নিত্যই সে কাজ করে থাকি।

৪। আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম সবই নিরর্থক হয় কেন?

কী জীবনে, কী সাহিত্যে, কোন একটা বিশেষ মত কী ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে আমাদের যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম সবই নিরর্থক হয়ে যায়।

৫। কোন কথা শোভা পায় না? কেন?

‘এ পথও জানি ও পথও জানি কিন্তু কি করব মরে আছি', এই কথা বলা আমাদের মুখে শোভা পায় না, কারণ বাজে লোকে যাই মনে করুক না কেন, সাহিত্যসেবী এবং অহিফেন সেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।

৬। সাহিত্য ক্ষেত্রে কারা দখল করে আছে? আমরা কি করছি? আমাদের নাবালক অবস্থায় সাধুভাষীর দল সাহিত্যক্ষেত্র দখল করে বসে আছেন। আমরা কেবল আমাদের অম্বয়াগত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।

৭। প্রতিবাদীরা কি জানেন?

প্রতিবাদীরা জানেন যে, Possession is nine Points of the law, সুতরাং তাদের। বিশ্বাস যে, আমাদের মাতৃভাষার দাবি তামাদি হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে তাদের আর উচ্চবাচ্য করবার দরকার নেই।।

৮। যারা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলে গণ্য করেন তারা কী ভাবেন?

মাতৃভাষাকে যারা ইতর ভাষা হিসাবে গণ্য করেন তারা হয়তো বঙ্গসাহিত্য রচনা ব্যাপারটি উচ্চভাষণ স্বরূপ মনে করেন এবং সুবুদ্ধিবশত দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত বিবেচনা করেন।

৯। প্রচলিত আচার ব্যবহারকে মন দিয়ে যাচিয়ে নেওয়াতে বিপদ কেন?

কেননা তাদের মতে, শুধু স্ত্রী বুদ্ধি নয়, বুদ্ধি মাত্রই প্রলয়ংকরী।

১০। কোন্‌টি সাহিত্য নয়?

যে লেখার ভিতর মানব মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা সাহিত্য নয়।

১১। ললিতবাবু সাধুভাষার পক্ষে কি আবিষ্কার করেছেন?

ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে সাধুভাষার সপক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন— ক) সাধুভাষা আর্টের অনুকুল।

খ) চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি-মারাঠি-গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেদের কাছে বেশি সহজবোধ্য।

১২ । সাধুভাষায় প্রাবন্ধিকের আপত্তি কি?

তাঁর প্রধান আপত্তি হল, এরূপ কৃত্রিম ভাষায় আটের কোনো স্থান নেই।

১৩। রচনার প্রধান গুণ কি?

রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা।

১৪। রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের একমাত্র উপায় কী?

ভারতবর্ষের নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করেও সকলকে এক যোগসূত্র বন্ধন

১৫। রাষ্ট্রীয় ভাবনার সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সম্পর্ক কি?

রাষ্ট্রীয় ভাবনা যখন অতি ফলাও হয়ে ওঠে এবং দেশে-বিদেশে চারিয়ে যায়, তখন সে ভাবনা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। বঙ্গসাহিত্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হবে, তত তার স্বাতন্ত্র্য আরো ফুটে উঠবে, লোপ পাবে না।

১৬। রামমোহনের গদ্য কেমন?

রামমোহনের গদ্যে বাগাড়ম্বর নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃত বহুলও নয়।

১৭। বিদ্যাসাগরের ভাষা সুখোপাঠ্য হয়েছে কীভাবে?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তুলনা করে দেখলে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, অন্বয় গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

১৮। পণ্ডিতি বাংলা কোথায় রক্ষিত?

ললিতবাবুর মতে পণ্ডিতি বাংলার কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন-সমিতির বায়ু শুন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত। ১৯। আমাদের রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার সংযম বিষয়ে ললিতবাবুর সিদ্ধান্ত কি?

এক সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়েছে, এবং আজকাল। ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সকল ভাষাতেই যাহা ঘটিয়াছে বাংলা ভাষাতেও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

২০। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মত কী?

অন্যান্য দেশীয় ভাষা হতে গৌড়দেশের ভাষা উত্তম, সর্বোত্তমা, সংস্কৃতভাষা বাংলা

২১। সংস্কৃত বৈয়াকর নিকদের মতে ভাষাশব্দ কয় প্রকার?

তাদের মতে ভাষাশব্দ ত্রিবিধ-তজ, তৎসম, দেশ্য। বঙ্গভাষায় তাজ, এবং তলে শব্দের সংখ্যা অসংখ্য দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য।

১৪.৮ বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি

এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন তর্ক হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের মতো সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো মীমাংসা উপস্থিত হতে হলে বাদী প্রতিবাদী দুইপক্ষে যুক্তি দরকার। শ্রীযুক্ত রাধা কমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' বাস্তব ' প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গ থেকে তিনি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দোষ গুণ বিচার করা তার উদ্দেশ্য নয় , কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নেই বললে কিছুই বলা হয়না।কোন কাব্যে কী আছে তা আবিষ্কার করা সমালোচনার শুধুমাত্র মুখ্য নয়,একমাত্র উদ্দেশ্য । অবিমারকে যা আছে শকুন্তলাতে তা নেই, শকুন্তলা য় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই। মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই - একথা সম্পূর্ণ সত্যি হলো এতে আমাদের কোনো জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না ।কোন ব্যক্তি আইসল্যান্ড সম্বন্ধে একখানি

বই লেখেন। তার মতে আইসল্যান্ডে সাপ নেই। এই বই সম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত যে এর থেকে আইসল্যান্ড সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না।কোন বিশেষ পদার্থের অভাব নয় সদ্ভাব এর উপর মানুষের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন রাধা কমল বাবুর প্রতিবাদ করা তার উদ্দেশ্য নয়। কোন একটি মতের খন্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি তা জানা প্রয়োজন। আইসল্যান্ডে সাপ নেই একথা প্রমান করার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে সে দেশে সাপ আছে এবং তার জন্য সাপ যে কি বস্তু সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বস্তুতন্ত্রতা আছে কি নেই সে বিচার করতে প্রাবন্ধিকের মধ্যে তিনি অপারগ। কারণ রাধা কমলবাবুর দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে বস্তুতন্ত্রতা যে কি বস্তু তার পরিচয় তিনি লাভ করতে পারেননি । তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিত্য বস্তুর উল্লেখ করেছেন বস্তুত তার অর্থ গ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহলে নিত্য বস্তুতন্ত্রতার অর্থ গ্রহণ করা যে অসম্ভব সে কথা বলাই বাহুল্য । সেই বস্তুই নিত্য যা কালের অধীন নয়। এই পদার্থ পৃথিবীতে আছে একথা এ দেশের প্রাচীন আচার্যের স্বীকার করেননি। যে বস্তু জগতে নেই সে বস্তু যদি কোন কাব্যে না থাকে তাহলে সে কাব্যের বিশেষ কোনো দোষ দেয়া যায় না কারণ এই জগত হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।

প্রাবন্ধিকের মতে বস্তুতন্ত্রতা আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক। কারণ বস্তুতন্ত্রতা সত্যের মাপকাঠি । এই বাক্যটি বাংলা সাহিত্যে আগে ছিল না ,সুতরাং সাহিত্য সমাজে এটি প্রচলন করা যায কিনা দেখতে হবে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এই বাক্যটি নেই, দর্শন শাস্ত্রে আছে। কাব্য ও দর্শনের যোগাযোগ থাকলেও দুটি পৃথক জাতীয় সাহিত্য।দার্শনিক মাত্রেই নাম রূপের বহির্ভূত দু'একটি ধ্রুব সত্যের সন্ধান করেন। অন্যদিকে নাম রূপ নিয়ে কবিদের কাজ । সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা সবসময় নিরাপদ নয়। তবে শঙ্করের বস্তুতন্ত্রতা কাব্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে প্রাবন্ধিকের কোন আপত্তি নেই। শঙ্করের মতে "জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ জন্য ; প্রমান আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে,অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা না করা এবং অন্যথা করা

যায় না।"

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুনে কোন কবির হাতে বেল কুল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে তার ভুল হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।রাধা কমল অবশ্য একথা বলেননি। কারণ যে কবির হাতে বাংলার মাটি বাংলার জল পরিচিতি লাভ করেছে তার যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই একথা কোন সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি লোকের চোখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান নেই একথা মানা যায়না। বস্তুতন্ত্রতা কে যদি কোন বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে সেটির অনিত্য বস্তুতন্ত্রতার সংজ্ঞা দিতে হয়।

ইউরোপের সাহিত্যের রিয়ালিজম নাম বদলে বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নামে দেখা দিয়েছে সুতরাং বস্তুতন্ত্রতা বিচার করতে হলে রিয়ালিজম এর পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। ইউরোপে আইডিয়ালিজম বিরুদ্ধে রিয়ালিজম দর্শনের জন্ম হয়। আইডিয়ালিজম মূল কথা হচ্ছে ব্রম্ভ সত্য জগৎ মিথ্যা কিন্তু রিয়ালিজম এর মূলকথা জগৎ সত্য ব্রম্ভ মিথ্যা । কিন্তু এটি অত্যন্ত স্থূল প্রভেদ। কারণ এই দুইয়ের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। রাধা কমল বাবু বস্তুতন্ত্রতা স্বপক্ষে বার্নাড শ এর কথা বলেছেন।কিন্তু বার্নাড শ এর অভিমত বস্তুতন্ত্রতা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্ভবত নেই ।কিন্তু রাধাকমল বাবু কখনোই বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতা চর্চা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। কারণ তিনি চান যে সাহিত্য জনসাধারণের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অপরপক্ষে শ চান যে সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শকে দূর করবে।

রিয়ালিজম শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ইউরোপীয় সাহিত্যের সুপরিচিত। রিয়েলিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা। ভিক্টর হুগো মতো লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদে ফ্লবেয়ারের মতো লেখকরা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

রোমান্টিসিজম এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই সাহিত্য মনগড়া। রোমান্টিক কবিতার উৎস ও তার মানস পুত্র ও কন্যারা যে পৃথিবীর সন্তান নন এবং তারা যে জগতে

বিচরণ করে সেটি কবির স্বপ্ন রাজ্য। ফরাসি রিয়েলিজম এখানেই আঘাত করে। রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতা বলতে গিয়ে মৃণালের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মফুল ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব থাকবে না। তবে মিনাল যদি বাস্তব হয় পদ্ম যে কেন তা নয় সেটি প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বুঝতে পারেননি । তার মতে তাহলে এই দাড়ালো যে,যে যার নিচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার কান্ড ,কান্ডের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি উত্তরোত্তর বাস্তব হয়ে ওঠে। এই সূত্র ধরে দাঁড়ায় পঙ্কজের অপেক্ষা পংকে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে। এছাড়াও গোলাপের উদাহরণ প্রবন্ধ দেওয়া আছে। কিন্তু প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ভাবের বীজ হাওয়ায় ওরে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভেতর সংগঠিত হয়। রাধা কমল বাবু বলেছেন "জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতে কবির মন রস সঞ্চার করে।"

এ কথা সত্য হলে কোন কাব্য যদি শুষ্ক হয় তাহলে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তাহলে কাব্য কোথা থেকে রস সঞ্চয় করবে।কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কবির মন থেকে একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস কবির কাজ হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা।কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কিন্তু সমাজের কাছে কবি যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশী দান করেন।আমাদের মনের যে অংশে ও যে পরিমাণে বহির্জগতের অধীন সেই অংশের সেই পরিমাণে তা বদ্ধ। যে অংশে যে পরিমাণে তার স্বাধীন সেই অংশে কতটা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দর মঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা তখন আমরা বদ্ধ জীব।যখন নতুন সত্যসুন্দর মঙ্গলের স্রষ্টা তখন মুক্ত জীব।যার কোন কিছুর সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই রিপোর্টার হতে পারেন। ধর্মের প্রবর্তক আর্টিস্ট মানুষের যথার্থ শিক্ষক কারণ তারাই মানবসমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। এই কারণে যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েশ পরতে পারে না তার জন্য যদি তাকে আত্মম্ভরী বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতার ত্যাগ করেন না।

প্রবন্ধকার এর মতে দেশকালের ভেতর সম্পূর্ণ বদ্ধ না করতে পারলে জড় বস্তুর সঙ্গে মানব মনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না তার মতে মেট রিয়ালিজমের সঙ্গে রিয়েলিজমের গোড়ায় গলদ থেকে যায়। এখানে প্রবন্ধকার রাধা কমল বাবুর মতামত উল্লেখ করে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে তিনি কবি প্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়,স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তাঁর মতে যদি যুগধর্ম অনুসরণ করতে হয় তা হলে এ যুগের কবিদের পক্ষে ন্যাশনাল epic সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আবার যেহেতু আজকের কবিরা বাংলায় বসবাস করলেও বিদেশি আবহাওয়ায় বাস করে তাই তাদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাব বর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব।

প্রবন্ধকার এর মতে যুগধর্ম অনুসারে এ যুগের সাহিত্যিকরা একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। যা তাদের সাহিত্যের গুণ এবং দোষ দুটোই। যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা - একথা কে সত্য বলে অগ্রাহ্য করতে তিনি সুনির্দিষ্ট দুটি যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর কথা অনুযায়ী প্রথমত যুগধর্ম বলে কোন যুগের একটিমাত্র ধর্ম থাকে না। একই যুগে নানা পরস্পর বিরোধী মতামত দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে কাব্য, ধর্ম,আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মার ই লীলা। যার এক অংশ কালের অধীন কিন্তু অপর অংশ মুক্ত ও স্বধীন।

প্রবন্ধকার এর মতে নতুন যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয় তাহলে সাহিত্য বর্তমান যুগ ধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই সেই আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনের চোখেই পাওয়া যায় জীবনে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে বর্তমান সমাজের আদর্শের উচ্ছেদ করা প্রয়োজন অর্থাৎ যুগ ধর্মের বিরোধী হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধের এই পর্বে ত্রিবান্দম প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে বানাচ্ছ নিজেকে আর্ট ফর আর্ট এর দলের বলে মনে করতেন না। তিনি এবং তাঁর গুরু ইপসেন ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাকেই জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে প্রবন্ধকার মনে করেন যে সাহিত্য কে কোন একটা বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য। এই পর্যায়ে তিনি সনাতন বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন যে কোন একটা বিশেষ

যুগের নয় কিন্তু সব যদি সত্য না হয় সমস্যা । প্রবন্ধকার এর মতে তাই হচ্ছে মানব মনের পক্ষে 'চিরপুরাতন ও চিরনতুন'। তার মতে বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার ইচ্ছে থেকেই আর্ট ফর আর্ট মতের উৎপত্তি হয়েছে। প্রবন্ধকার এর মতে কাব্য ধর্ম বা দর্শন সবই হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম।তার মতে এই সত্য উপেক্ষা করার ফলেই ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রী হারিয়ে ফেলেছে।

মানব সমাজকে হয় যন্ত্র নয় অঙ্গী রূপে গ্রাহ্য করলে এবং একই সাথে মানুষের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে সাহিত্যিক এবং তার রচনা একই যুগধর্মের অধীন হয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে তিনি আইকনের একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন-

All spiritual creation processes superiority as compared with the age and liberates man from its compulsion may it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time.

তার মতে কবির কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ । ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক যুগের চোখ রাঙানি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারেন।

প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থবিদ এই দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয। রিয়েলি জমের পুতুল নাচ এবং আইডিয়ালিজম ছায়াবাজি উভয়ই কাব্য কাব্য হলো জীবনের প্রকাশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই একাধারে দিয়ে লিস্ট এবং আইডিয়া লিস্ট কি বহির্জগৎ মনোযোগের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

তার মতে ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব করছে অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে অর্থ বিজ্ঞানের যে অংশটা খাঁটি সেটা ইউরোপের হাতে পড়েছে আর তার জন্য সেটা আমাদের মনে ধরেছে ইউরোপ পঞ্চভূত নিযুক্ত করেছে আর আমরা তাদের পঞ্চদেবতা করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছি।

১৪.৯ অনুশীলনী

১। সাধুভাষার বিপক্ষে প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর নিজের রচিত চলিত ভাষার এই গুণের প্রকাশ কতদূর সার্থক হয়েছে, দৃষ্টান্ত সহযোগে তা বিচার কর।

২। ‘সাধু ভাষার’ পরিবর্তে সাহিত্যে 'চলিত ভাষা’ প্রবর্তনের পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিগুলির সার সঙ্কলন করে ভাষা-সংস্কারে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩। বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় এই প্রবন্ধের মুল্য বিচার কর।

৪। ‘কি জীবনে কি সাহিত্যে কোন একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে পারলে আমাদের যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম সবই নিরর্থক হয়ে যায়।’—'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী এই মত ব্যক্ত করে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সে বিষয়ে আলোচনা কর।

৫। সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য বিষয় আলোচনা কর।

৬। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পক্ষে এবং বিপক্ষে লেখক যেসব যুক্তি রেখেছেন তা আলোচনা কর।

৭। বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি বঝাতে প্রাবন্ধিক কি ভাবে উদাহরণ সহ বস্তুতন্ত্রতাকে ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা কর।

৮। ‘বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী কোন পক্ষ অবলম্বন করেছেন, যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ সংগ্রহ- প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ পাঠ ও বিশ্লেষণ- ভুটান চন্দ্র ঘোষ ,অরুন কুমার পাল